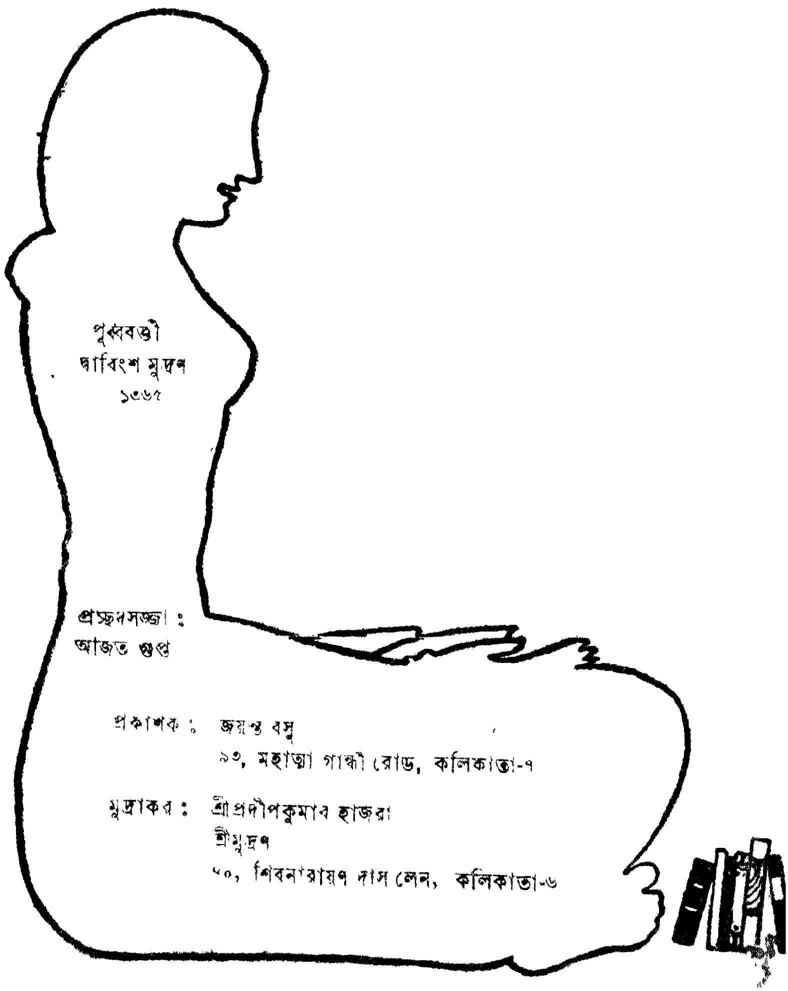
শ্রীকান্ত

১ম পর্ব্ব

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭



পূর্ববর্তী
দ্বাবিংশ মুদ্রণ
১৩৬৮

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : জয়ন্ত বসু
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রদীপকুমার হাজরা
শ্রীমুদ্রণ
৫০, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬





এক

আমার এই 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্নবেলায় দাঁড়াইয়া, ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে !

ছেলেবেলা হইতে এম্‌নি করিয়াই ত বুড়া হইলাম। আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের মুখে শুধু একটা একটানা 'ছি-ছি' শুনিয়া শুনিয়া, নিজেও নিজের জীবনটাকে একটা মস্ত 'ছি-ছি-ছি' ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু, কি করিয়া যে জীবনের প্রভাতেই এই সুদীর্ঘ 'ছি-ছি'র ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, বহু কালান্তরে আজ সেইসব স্মৃত ও বিস্মৃত কাহিনীর মালা গাঁথিতে বসিয়া যেন হঠাৎ সন্দেহ হইতেছে, এই 'ছি-ছি'টা যত বড় করিয়া সবাই দেখাইয়াছে, হয়ত ঠিক তত বড়ই ছিল না। মনে হইতেছে, হয়ত ভগবান্ যাহাকে তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির ঠিক মাঝখানটিতে টান দেন, তাহাকে ভাল-ছেলে হইয়া এক্‌জামিন্ পাশ করিবার সুবিধাও দেন না, গাড়ী-পাল্কী চড়িয়া বহু লোক-লস্কর সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিয়া, তাহাকে 'কাহিনী' নাম দিয়া ছাপাইবার অভিরুচিও দেন না। বুদ্ধি হয়ত তাহাদের কিছু দেন, কিন্তু বিষয়ী লোকেরা তাহাকে সু-বুদ্ধি বলে না। তাই প্রবৃত্তি তাহাদের এম্‌নি অসঙ্গত, খাপছাড়া—এবং দেখিবার বস্তু ও তৃষ্ণাটা স্বভাবতঃই এতই বেয়াড়া হইয়া উঠে যে, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে সুধী ব্যক্তিরা বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন। তারপরে সেই মন্দ ছেলেটি যে কেমন করিয়া অনাদরে অবহেলায় মন্দের আকর্ষণে মন্দ হইয়া, ধাক্কা খাইয়া, ঠোক্কর খাইয়া, অজ্ঞাতসারে অবশেষে একদিন অপযশের ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া কোথায় সরিয়া পড়ে—সুদীর্ঘদিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না।

অতএব এ-সকলও থাক্। যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি। কিন্তু বলিলেই ত বলা হয় না, ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। যাহার পা-দুটো আছে, সে-ই ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু হাত-দুটা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না। সে যে ভারি শক্ত। তা' ছাড়া মস্ত

মুস্কিল হইয়াছে আমার এই যে, ভগবান্ আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দু'টো পোড়া-চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি, ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড়-পর্ব্বতকে পাহাড়-পর্ব্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া, জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ। কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া-চাহিয়া চোখ ঠিক্‌রাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাহারো মুখটুকু ত কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান্ যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।

কিন্তু কি করিয়া 'ভবঘুরে' হইয়া পড়িলাম, সে-কথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ। আমাদের প্রথম আলাপ একটা 'ফুটবল ম্যাচে'। আজ সে বাঁচিয়া আছে কি না, জানি না। কারণ বহু বৎসর পূর্ব্বে একদিন অতি প্রত্যূষে ঘর-বাড়ী, বিষয়-আশয়, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে একবস্ত্রে সে সংসারত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না! উঃ—সে দিনটা কি মনেই পড়ে!

ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের 'ফুটবল ম্যাচ'। সন্ধ্যা হয় হয়। মগ্ন হইয়া দেখিতেছি। আনন্দের সীমা নাই। হঠাৎ—ওরে বাবা—এ কি রে! চটাপট্ চটাপট্ শব্দ এবং 'মারো শালাকে, ধরো শালাকে।' কি একরকম যেন বিহ্বল হইয়া গেলাম। মিনিট দুই তিন ইতিমধ্যে কে যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল, ঠাহর পাইলাম না; ঠাহর পাইলাম ভাল করিয়া তখন, যখন পিঠের উপর একটা মস্ত ছাতির বাঁট পটাশ করিয়া ভাঙ্গিল এবং আরো গোটা-দুই-তিন মাথার উপর, পিঠের উপর, উদ্যত দেখিলাম। পাঁচ-সাতজন মুসলমান ছোকরা তখন আমার চারিদিকে ব্যূহ-রচনা করিয়াছে—পলাইবার এতটুকু পথ নাই।

আরও একটা ছাতির বাঁধ—আরও একটা। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যে মানুষটি বাহির হইতে বিদ্যুদ্‌গতিতে ব্যূহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল—সে-ই ইন্দ্রনাথ।

ছেলেটি কালো। তাহার বাঁশীর মত নাক, প্রশস্ত সুডৌল কপাল, মুখে দুই-চারিটি বসন্তের দাগ। মাথায় আমার মতই, কিন্তু বয়সে কিছু বড়। কহিল, ভয় কি! ঠিক আমার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এস।

ছেলেটির বুকের ভিতর সাহস এবং করুণা যাহা ছিল, তাহা সুদুর্ল্লভ হইলেও, অসাধারণ হয়ত নয়; কিন্তু তাহার হাত দু'খানি যে সত্যই অসাধারণ, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

শুধু জোরের জন্য বলিতেছি না। সে দু'টি দৈর্ঘ্যে তাহার হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত পড়িত। ইহার পরম সুবিধা এই যে, যে ব্যক্তি জানিত না, তাহার কস্মিন্‌কালেও এ আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে না যে, বিবাদের সময় ঐ খাটো মানুষটি অকস্মাৎ হাত-তিনেক লম্বা একটা হাত বাহির করিয়া তাহার নাকের উপর এই আন্দাজের মুষ্ট্যাঘাত করিবে। সে কি মুষ্টি! বাঘের থাবা বলিলেই হয়।

মিনিট-দু'য়ের মধ্যে তাহার পিঠ-ঘেঁষিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। ইন্দ্র বিনা-আড়ম্বরে কহিল 'পালা'।

ছুটিতে সুরু করিয়া কহিলাম, 'তুমি'?

সে রুক্ষভাবে জবাব দিল, 'তুই পালা না—গাধা কোথাকার!'

গাধাই হই—আর যাই হই, আমার বেশ মনে পড়ে, আমি হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম,—'না'।

ছেলেবেলায় মারপিট কে না করিয়াছে? কিন্তু, পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমরা—মাস দুই তিন পূর্ব্বে লেখাপড়ার জন্য সহরে পিসিমার বাড়ী আসিয়াছি—ইতিপূর্ব্বে এভাবে দল বাঁধিয়া মারামারিও করি নাই, এমন আস্ত দু'টা ছাতার বাঁট পিঠের উপরও কোনদিন ভাঙ্গে নাই। তথাপি একা পলাইতে পারিলাম না। ইন্দ্র একবার আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, 'না—তবে কি? দাঁড়িয়ে মার খাব নাকি?—ঐ, ওই দিক্ থেকে আসছে—আচ্ছা, তবে খুব ক'সে দৌড়ো—'

এ কাজটা বরাবরই খুব পারি। বড় রাস্তার উপরে আসিয়া যখন পৌঁছানো গেল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দোকানে দোকানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং পথের উপর মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিন ল্যাম্প লোহার থামের উপর এখানে একটা আর ওই ওখানে আর একটা জ্বালা হইয়াছে। চোখের জোর থাকিলে, একটার কাছে দাঁড়াইয়া আর একটা দেখা যায় না, তা নয়। আততায়ীর শঙ্কা আর নাই। ইন্দ্র অতি সহজ স্বাভাবিক গলায় কথা কহিল। আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্য, সে এতটুকুও হাঁপায় নাই। এতক্ষণ যেন কিছুই হয় নাই—মারে নাই, মার খায় নাই, ছুটিয়া আসে নাই—না, কিছুই নয়; এম্‌নিভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তোর নাম কি রে?

শ্রী—কা—ন্ত—

শ্রীকান্ত? আচ্ছা। বলিয়া সে তাহার পকেট হইতে একমুঠা শুক্‌না পাতা বাহির করিয়া কতকটা নিজের মুখে পুরিয়া দিয়া, কতকটা আমার হাতে দিয়া বলিল, ব্যাটাদের খুব ঠুকেছি—চিবো।

কি এ?

সিদ্ধি।

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, সিদ্ধি? এ আমি খাইনে।

সে ততোধিক বিস্মিত হইয়া কহিল, খাস্‌নে! কোথাকার গাধা রে? বেশ নেশা হবে—চিবো! চিবিয়ে গিলে ফ্যাল্‌।

নেশা জিনিষটার মাধুর্য্য তখন ত আর জানি নাই, তাই, ঘাড় নাড়িয়া ফিরাইয়া দিলাম। সে তাহাও নিজের মুখে দিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিল।

আচ্ছা, তা হলে সিগ্‌রেট খা। বলিয়া আর একটা পকেট হইতে গোটা-দুই সিগ্‌রেট ও দেশলাই বাহির করিয়া, একটি আমার হাতে দিয়া, অপরটা নিজে ধরাইয়া ফেলিল। তারপরে তাহার দুই করতল বিচিত্র উপায়ে জড়ো করিয়া সেই সিগ্‌রেটটাকে কলিকার মত করিয়া টানিতে লাগিল। বাপ্‌রে—সে কি টান! একটানে সিগ্‌রেটের আগুন মাথা হইতে তলায় নামিয়া আসিল। চারিদিকে লোক—আমি অত্যন্ত ভয়

পাইয়া গেলাম। সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, চুরুট খাওয়া কেউ যদি দেখে ফ্যালে ?

ফেল্‌লেই বা। সবাই জানে! বলিয়া স্বচ্ছন্দে সে টানিতে টানিতে রাস্তার মোড় ফিরিয়া, আমার মনের উপর একটা প্রগাঢ় ছাপ মারিয়া দিয়া আর একদিকে চলিয়া গেল।

আজ আমার সেইদিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। শুধু এইটি স্মরণ করিতে পারিতেছি না—ঐ অদ্ভুত ছেলেটিকে সেদিন ভালবাসিয়াছিলাম, কিম্বা, তাহার প্রকাশ্যে সিদ্ধি ও ধূমপান করার জন্য তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলাম।

* * * *

তারপর মাস-খানেক গত হইয়াছে। সেদিনের রাত্রিটা যেমন গরম, তেমনি অন্ধকার। কোথাও গাছের একটি পাতা পর্য্যন্ত নড়ে না। ছাদের উপর সবাই শুইয়া ছিলাম। বারোটা বাজে, তথাপি কাহারো চক্ষে নিদ্রা নাই। হঠাৎ কি মধুর বংশীস্বর কানে আসিয়া লাগিল। সহজ রামপ্রসাদী সুর। কত ত শুনিয়াছি, কিন্তু বংশীতে যে এমন মুগ্ধ করিয়া দিতে পারে তাহা জানি না। বাড়ীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান। ভাগের বাগান, অতএব কেহ খোঁজ-খবর লইত না—সমস্ত নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। শুধু গরু-বাছুরের যাতায়াতে সেই বনের মধ্য দিয়া সরু একটা পথ পড়িয়াছিল। মনে হইল, যেন সেই বনপথেই বাঁশীর সুর ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। পিসিমা উঠিয়া বসিয়া তাঁহার বড় ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হ্যাঁ রে নবীন, বাঁশী বাজায় কে, রায়েদের ইন্দ্র নাকি? বুঝিলাম ইহারা সকলেই ওই বংশীধারীকে চেনেন। বড়দা বলিলেন, সে হতভাগা ছাড়া এমন বাঁশীই বা বাজাবে কে, আর ঐ বনের মধ্যেই বা ঢুকবে কে?

বলিস্ কি রে? ও কি গোঁসাইবাগানের ভেতর দিয়ে আসছে নাকি?

বড়দা বলিলেন, হুঁ।

পিসিমা এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ওই অদূরবর্ত্তী গভীর জঙ্গলটা স্মরণ করিয়া মনে মনে বোধ করি শিহরিয়া উঠিলেন! ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা,

ওর মা কি বারণ করে না? গোঁসাইবাগানে কত লোক যে সাপের কামড়ে মরেছে তার সংখ্যা নেই—আচ্ছা, ও জঙ্গলে এত রাত্তিরে ছোঁড়াটা কেন?

বড়দা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর কেন? ও-পাড়া থেকে এ-পাড়ায় আসার এই সোজা পথ। যার ভয় নাই, প্রাণের মায়া নাই, সে কেন বড় রাস্তা ঘুরতে যাবে, মা? ওর শীগ্‌গির আসা নিয়ে দরকার তা সে-পথে নদী-নালাই থাক্ আর সাপ-খোপ বাঘ-ভালুকই থাক্।

ধন্যি ছেলে! বলিয়া পিসিমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। বাঁশীর স্বর ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া আবার ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া দূরে মিলাইয়া গেল।

এই সেই ইন্দ্রনাথ। সেদিন ভাবিয়াছিলাম যদি অতখানি জোর এবং এমনি করিয়া মারামারি করিতে পারিতাম! আর আজ রাত্রে যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িলাম, ততক্ষণ কেবলই কামনা করিতে লাগিলাম—যদি অমনি করিয়া বাঁশী বাজাইতে পারিতাম!

কিন্তু কেমন করিয়া ভাব করি! সে যে আমার অনেক উচ্চে। তখন ইস্কুলেও সে আর পড়ে না। শুনিয়াছিলাম হেডমাষ্টার মহাশয় অবিচার করিয়া তাহার মাথায় গাধার টুপি দিবার আয়োজন করিতেই সে মর্ম্মাহত হইয়া অকস্মাৎ হেডমাষ্টারের পিঠের উপর কি একটা করিয়া ঘৃণাভরে ইস্কুলের রেলিং ডিঙাইয়া বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিল, আর যায় নাই। অনেকদিন পরে তাহার মুখেই শুনিয়াছিলাম সে অপরাধ অতি অকিঞ্চিৎ। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতজীর ক্লাসের মধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ হইত। এমনি একসময়ে সে তাঁহার গ্রন্থিবদ্ধ শিখাটি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ছোট করিয়া দিয়াছিল মাত্র। বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই। কারণ, পণ্ডিতজী বাড়ী গিয়া তাঁহার নিজের শিখাটি নিজের চাপকানের পকেটেই ফিরিয়া পাইয়াছিলেন—খোয়া যায় নাই! তথাপি কেন যে পণ্ডিতের রাগ পড়ে নাই এবং হেডমাষ্টারের কাছে নালিশ করিয়াছিলেন—সে কথা আজ পর্য্যন্ত ইন্দ্র বুঝিতে পারে নাই। সেটা পারে নাই; কিন্তু এটা সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে ইস্কুল হইতে রেলিং ডিঙাইয়া বাড়ী আসিবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইলে, তথায় ফিরিয়া যাইবার পথ গেটের ভিতর দিয়া আর

প্রায়ই খোলা থাকে না। কিন্তু খোলা ছিল কি ছিল না, এ দেখিবার সখও তাহার আদৌ ছিল না। এমন কি, মাথার উপর দশ-বিশ জন অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও কেহ কোনমতেই আর তাহার মুখ বিদ্যালয়ের অভিমুখে ফিরাইতে সক্ষম হইল না! ইন্দ্র কলম ফেলিয়া দিয়া নৌকার দাঁড় হাতে তুলিল। তখন হইতে সে সারাদিন গঙ্গায় নৌকার উপর। তাহার নিজের একখানা ছোট ডিঙ্গি ছিল; জল নাই, ঝড় নাই, দিন নাই, রাত নাই—একা তাহারই উপর। হঠাৎ হয়ত একদিন সে পশ্চিমের গঙ্গার একটানা স্রোতে পানসি ভাসাইয়া দিয়া, হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—দশ-পনের দিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না। এমনি একদিন উদ্দেশ্যবিহীন ভাসিয়া যাওয়ার মুখেই তাহার সহিত আমার একান্ত-বাঞ্ছিত মিলনের গ্রন্থি সুদৃঢ় হইবার অবকাশ ঘটিয়াছিল। তাই এত কথা আমার বলা।

কিন্তু যাহারা আমাকে জানে, তাহারা বলিবে, তোমার এ সাজে নাই বাপু। গরীবের ছেলে, লেখাপড়া শিখিতে গ্রাম ছাড়িয়া পরের বাড়ীতে আসিয়াছিলে; তাহার সহিত তুমি মিশিলেই বা কেন এবং মিশিবার জন্য এত ব্যাকুল হইলেই বা কেন? তা না হইলে ত আজ তোমার—

থাক্ থাক্, আর বলিয়া কাজ নাই। সহস্র লোক এ-কথা আমাকে লক্ষবার বলিয়াছে, নিজেকে নিজে এ প্রশ্ন কোটীবার করিয়াছি। কিন্তু সব মিছে। কেন যে—এ জবাব তোমরাও দিতে পারিবে না; এবং না হইলে আজ আমি কি হইতে পারিতাম সে প্রশ্ন সমাধান করিতেও কেহ তোমরা পারিবে না। যিনি সব জানেন, তিনিই শুধু বলিয়া দিতে পারেন—কেন এত লোক ছাড়িয়া সেই হতভাগার প্রতিই আমার সমস্ত প্রাণটা পড়িয়া থাকিত এবং কেন সেই মন্দের সঙ্গে মিলিবার জন্যই আমার দেহের প্রতি কণাটি পর্য্যন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

* * * *

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে

ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয়-ভাই নিত্য-প্রথামত বাহিরের বৈঠকখানায় ঢালা-বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দার একদিকে পিসেমশায় ক্যাম্বিসের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্ধ্য-তন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্চায আফিং খাইয়া অন্ধকারে চোখ বুজিয়া থেলো হুঁকায় ধূমপান করিতেছিলেন। দেউড়ীতে হিন্দুস্থানী পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শুনা যাইতেছে, এবং ভিতরে আমরা তিনভাই মেজ'দার কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি। ছোড়দা, যতীনদা ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি এবং গম্ভীর-প্রকৃতি মেজদা বার-দুই এন্ট্রান্স ফেল করিবার পর গভীর মনোযোগের সহিত তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে একমুহূর্ত্ত কাহারো সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না। আমাদের পড়ার সময় ছিল সাড়ে-সাতটা হইতে নয়টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিয়া মেজদার 'পাশে'র পড়ার বিঘ্ন না করি, এইজন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া বিশ-ত্রিশখানি টিকেটের মত করিতেন। তাহার কোনটাতে লেখা থাকিত 'বাইরে', কোনটাতে 'থুথুফেলা', কোনটাতে 'নাকঝাড়া', কোনটাতে 'তেষ্টা পাওয়া' ইত্যাদি। যতীনদা একটা 'নাকঝাড়া' টিকিট লইয়া মেজদার সুমুখে ধরিয়া দিলেন। মেজদা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন—'হুঁ—৮টা ৩৩ মিনিট হইতে ৮টা ৩৪।।০ মিনিট পর্য্যন্ত', অর্থাৎ এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে। ছুটি পাইয়া যতীনদা টিকিট-হাতে উঠিয়া যাইতেই ছোড়দা 'থুথুফেলা' টিকিট পেশ করিলেন। মেজদা 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়দা মুখ ভারী করিয়া মিনিট-দুই বসিয়া থাকিয়া 'তেষ্টা পাওয়া' আর্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্জুর হইল। মেজদা সই করিয়া লিখিলেন—'হুঁ—৮টা ৪১ মিনিট হইতে ৮টা ৪৭ মিনিট পর্য্যন্ত'। পরওয়ানা লইয়া ছোড়দা হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা ঘড়ি দেখিয়া সময়

মিলাইয়া, একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট গঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছেই মজুত থাকিত। সপ্তাহ পরে এই সব টিকিটের সময় ধরিয়া কৈফিয়ৎ তলব করা হইত।

এইরূপে মেজদার অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সুশৃঙ্খলায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাহারও এতটুকু সময় নষ্ট হইতে পাইত না। প্রত্যহ এই দেড় ঘণ্টাকাল অতিশয় বিদ্যাভাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ীর ভিতর শুইতে আসিতাম, তখন মা-সরস্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্য্যন্ত আমাদিগকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন; এবং পরদিন ইস্কুলে ক্লাশের মধ্যে যে সকল সম্মান সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতাম, সে ত আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু মেজদার দুর্ভাগ্য, তাঁহার নির্ব্বোধ পরীক্ষকগুলো তাঁহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল্ করাইয়াই দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ বিচার! যাক্—এখন সে দুঃখ জানিয়া কি হইবে!

সে-রাত্রেও ঘরের বাহিরে ঐ জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্দ্রাভিভূত সেই ছুটো বুড়ো। ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে গভীর-অধ্যয়নরত আমরা চারিটি প্রাণী।

ছোড়দা ফিরিয়া আসায় তৃষ্ণায় আমার একেবারে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম। মেজদা তাঁহার সেই টিকিট-আঁটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—তৃষ্ণা-পাওয়াটা আমার আইনসঙ্গত কি না, অর্থাৎ কাল-পরশু কি পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা 'হুম্' শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্ত্ত-কণ্ঠের গগনভেদী রৈ-রৈ চীৎকার—"ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেললে রে!" কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্ব্বেই, মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার দুই পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া

দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদার ছিল ফিটের ব্যামো। তিনি সেই যে 'আঁ-আঁ' করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া, তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ী ফাটাইয়া ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ-বেটার কে কতখানি হাঁ করিতে পারে তারই লড়াই চলিতেছে।

এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ীর সিপাইরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চীৎকারে হুকুম দিতেছেন—আউর মারো-- শালাকে মার ডালো—ইত্যাদি।

মুহূর্ত্তকাল মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দরওয়ানরা চোরকে মারিতে মারিতে আধ-মরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়ীসুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল! আরে, এ যে ভট্‌চায্যিমশাই!

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস, কেহ বা তাঁহার চোখে-মুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতর মেজদা'কে লইয়া সেই ব্যাপার!

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপটা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল, আপনি অমন করে ছুট্‌ছিলেন কেন?

ভট্‌চায্যিমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, বাবা বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো!

ছোড়দা ও যতীনদা বারংবার কহিতে লাগিলেন, ভালুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হুম্ করে ল্যাজ গুটিয়ে পা-পোষের উপর বসেছিল।

মেজদার চৈতন্য হইলে, তিনি নিমীলিতচক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'।

কিন্তু কোথা সে? মেজদার 'দি রয়েল বেঙ্গল'ই হোক, আর

রামকমলের 'মস্ত ভালুক'ই হৌক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায়? এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা কিছু বটেই!

তখন কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিতনেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ বয়ঠা' বলিয়াই একলাফে একেবারে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি কাণ্ড। এতগুলো লোক, সবাই একসঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারো মুহূর্ত্ত বিলম্ব সয় না। উঠানের একপ্রান্তে একটা ডালিমগাছ ছিল, দেখা গেল, তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—সড়কি লাও—বন্দুক লাও—। আমাদের পাশের বাড়ীর গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরী গাদা-বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর।

'লাও' ত বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিমগাছটা যে দরজার কাছেই এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না, তামাসা দেখিতে যাহারা বাড়ী ঢুকিয়াছিল, তাহারাও নিস্তব্ধ।

এমনি বিপদের সময় হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ী ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়!

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসীমা ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন! নীচে ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী

সিপাহীরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল এবং একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, দ্বারিকাবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়। তাহার কথাটা শেষ হইতে-না-হইতেই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া কহিল, না বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী।

ইন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্‌চায্যিমশাই খড়ম হাতে সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন,—হারামজাদা! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?

পিসেমশাই মহাক্রোধে হুকুম দিলেন, শালাকো কান পাকাড়কে লাও।

কিশোরী সিং তাহাকে সর্ব্বাগ্রে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহারই দাবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া, সে-ই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভট্‌চায্যিমশায় তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দি বলিতে লাগিলেন,—এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁঠাল পাকায় দিয়া—

ছিনাথের বাড়ী বারাসতে। সে প্রতি বৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ-বাড়ীতে সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্‌চায্যিমশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উল্টাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায়, সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসীমা নিজে উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে, সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বা'র হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা,

আর তোমার দরওয়ানরা! ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর ক'রে দাও দেউড়ীর ঐ খোট্টাগুলোকে। একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ী লোকের তা' নেই।

পিসেমশাই কোন কথাই শুনিলেন না, বরং পিসীমার এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এই সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই পুরুষমানুষের পক্ষে অপমানকর। তাই, আরও গরম হইয়া হুকুম দিলেন, উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও। তখন, তাহার সেই রঙিন কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল।

পিসিমা উপর হইতে রাগ করিয়া বলিলেন, রেখে দাও, তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।

ইন্দ্র আমার দিকে চাহিয়া কহিল, তুই বুঝি এই বাড়ীতে থাকিস্ শ্রীকান্ত?

আমি কহিলাম, হ্যাঁ। তুমি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছ?

ইন্দ্র হাসিয়া কহিল, রাত্তির কোথায় রে, এই ত সন্ধ্যা। আমি যাচ্ছি আমার ডিঙিতে মাছ ধরে আনতে। যাবি?

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, এত অন্ধকারে ডিঙিতে চড়বে?

সে আবার হাসিল। কহিল, ভয় কি রে! সেই ত মজা। তা' ছাড়া অন্ধকার না হ'লে কি মাছ পাওয়া যায়? সাঁতার জানিস্?

খুব জানি।

তবে আয়, ভাই! বলিয়া সে আমার একটা হাত ধরিল। কহিল, আমি একলা এত স্রোতে উজোন বাইতে পারিনে—একজন কাউকে খুঁজি, যে ভয় পায় না।

আমি আর কথা কহিলাম না। তাহার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে রাস্তার উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমটা আমার নিজেরই যেন বিশ্বাস হইল না,—আমি সত্যই এই রাত্রে নৌকায় চলিয়াছি। কারণ, যে আহ্বানে এই স্তব্ধ-নিবিড়-নিশীথে এই বাড়ীর সমস্ত কঠিন শাসনপাশ তুচ্ছ করিয়া দিয়া একাকী বাহির হইয়া আসিয়াছি, সে যে কত বড় আকর্ষণ, তাহা তখন

বিচার করিয়া দেখিবার আমার সাধ্যই ছিল না। অনতিকাল পরে গোঁসাইবাগানের সেই ভয়ঙ্কর বনপথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং ইন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া, স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহা অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

খাড়া কাঁকরের পাড়। মাথার উপর একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ মূর্ত্তিমান অন্ধকারের মত নীরবে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই প্রায় ত্রিশ হাত নীচে সূচীভেদ্য আঁধারতলে পরিপূর্ণ বর্ষার গভীর জলস্রোত ধাক্কা খাইয়া, আবর্ত্ত রচিয়া, উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে। দেখিলাম, সেইখানে ইন্দ্রের ক্ষুদ্র তরীখানি বাঁধা আছে। উপর হইতে মনে হইল, সেই সুতীব্র জলধারার মুখে একখানি ছোট্ট মোচার খোলা যেন নিরন্তর কেবলই আছাড় খাইয়া মরিতেছে।

আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। কিন্তু ইন্দ্র যখন উপর হইতে নীচে একগাছি রজ্জু দেখাইয়া কহিল, ডিঙির এই দড়ি ধ'রে পা টিপে টিপে নেবে যা; সাবধানে নাবিস, পিছলে প'ড়ে গেলে আর তোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; তখন যথার্থই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, ইহা অসম্ভব। কিন্তু, তথাপি আমার ত দড়ি অবলম্বন আছে।

—কিন্তু তুমি?

সে কহিল, তুই নেবে গেলেই আমি দড়ি খুলে নিয়ে নাববো। ভয় নেই, আমার নেবে যাবার জন্য অনেক ঘাসের শিকড় ঝুলে আছে।

আর কথা না কহিয়া আমি দড়িতে ভর দিয়া অনেক যত্নে, অনেক দুঃখে নীচে আসিয়া নৌকায় বসিলাম। তখন দড়ি খুলিয়া দিয়া ইন্দ্র ঝুলিয়া পড়িল। সে যে কি অবলম্বন করিয়া নামিতে লাগিল, তাহা আজও আমি জানি না! ভয়ে বুকের ভিতরটায় এমনি টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল যে, তাহার পানে চাহিতেই পারিলাম না। মিনিট দুই-তিন কাল বিপুল জলধারার মত্ত-গর্জ্জন ছাড়া কোথাও শব্দমাত্র নাই। হঠাৎ ছোট্ট একটুখানি হাসির শব্দে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, ইন্দ্র দুই হাত দিয়া নৌকা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া লাফাইয়া চড়িয়া বসিল। ক্ষুদ্র তরী তীব্র একটা পাক খাইয়া নক্ষত্রবেগে ভাসিয়া চলিয়া গেল।

দুই

(কয়েক মুহূর্ত্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সমান্তরাল-প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্রগতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরণীটি এবং কিশোর বয়স্ক দু'টি বালক। প্রকৃতিদেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহা নহে, কিন্তু সে-কথা আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই। বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্ত্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে এবং সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপাহাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। আশে-পাশে সম্মুখে কোথাও বা উন্মত্ত জলস্রোত গভীর তলদেশে ঘা খাইয়া উপরে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা প্রতিকূল গতি পরস্পরের সংঘাতে আবর্ত্ত রচিয়া পাক খাইতেছে, কোথাও বা অপ্রতিহত জলপ্রবাহ পাগল হইয়া ধাইয়া চলিয়াছে।)

আমাদের নৌকা কোণাকুণি পাড়ি দিতেছে, এইমাত্র বুঝিয়াছি। কিন্তু পরপারের ঐ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কোন্‌খানে যে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে, তাহার কিছুই জানি না। এই বয়সেই সে যে কত বড় পাকা মাঝি, তখন তাহা বুঝি নাই। হঠাৎ সে কথা কহিল, —কি রে শ্রীকান্ত, ভয় করে ?

আমি বলিলাম, নাঃ—

ইন্দ্র খুসী হইয়া কহিল, এই ত চাই—সাঁতার জান্‌লে আবার ভয় কিসের !

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিলাম—পাছে সে শুনিতে পায়। কিন্তু, এই গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে, এই জলরাশি এবং এই দুর্জ্জয় স্রোতের সঙ্গে সাঁতার জানা এবং না-জানার পার্থক্য যে কি, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। সেও আর কোন কথা কহিল না। বহুক্ষণ এইভাবে

চলার পরে কি একটা যেন শোনা গেল—অস্ফুট এবং ক্ষীণ, কিন্তু নৌকা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে শব্দ স্পষ্ট এবং প্রবল হইতে লাগিল। যেন বহুদূরাগত কাহাদের ক্রুদ্ধ আহ্বান। যেন কত বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ডিঙাইয়া সে আহ্বান আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—এম্‌নি শ্রান্ত, অথচ বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—ক্রোধ যেন তাহাদের কমেও না—বাড়েও না—থামিতেও চাহে না। মাঝে-মাঝে এক একবার ঝুপ্-ঝাপ্ শব্দ। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইন্দ্র, ও কিসের আওয়াজ শোনা যায়?

সে নৌকার মুখটা আর একটু সোজা করিয়া দিয়া কহিল, জলের স্রোতে ওপারের বালির পাড় ভাঙার শব্দ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কত বড় পাড়? কেমন স্রোত?

সে ভয়ানক স্রোত। ওঃ, তাই ত, কা'ল জল হয়ে গেছে, আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। একটা পাড় ভেঙে পড়লে ডিঙি-শুদ্ধ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাবো। তুই দাঁড় টানতে পারিস্?

পারি।

তবে টান্।

আমি টানিতে সুরু করিলাম। ইন্দ্র কহিল, উই—উই যে কালো-মত বাঁ-দিকে দেখা যায়, ওটা চড়া। ওরি মধ্যে দিয়ে একটা খালের মত আছে, তারি ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে—কিন্তু খুব আস্তে—জেলেরা টের পেলে আর ফিরে আসতে হবে না। লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে পুঁতে দেবে।

এ আবার কি কথা! সভয়ে বলিলাম, তবে ওর ভিতর দিয়ে নাই গেলে।

ইন্দ্র বোধ করি একটু হাসিরা কহিল, আর ত পথ নেই। এর মধ্য দিয়ে যেতেই হবে। বড় চড়ার বাঁ-দিকের রেখ ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না—আমরা যাবো কি ক'রে? ফিরে আস্‌তে পারা যাবে, কিন্তু যাওয়া যাবে না।

তবে মাছ চুরি ক'রে কাজ নেই ভাই, বলিয়াই আমি দাঁড় তুলিয়া ফেলিলাম। চক্ষের পলকে নৌকা পাক খাইয়া পিছাইয়া গেল। ইন্দ্র

বিরক্ত হইয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া তর্জ্জন করিয়া উঠিল,—তবে এলি কেন? চল তোকে ফিরে রেখে আসি। কাপুরুষ! তখন চৌদ্দ পার হইয়া পনেরয় পড়িয়াছি—আমাকে কাপুরুষ? ঝপাৎ করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম। ইন্দ্র খুসী হইয়া বলিল, এই ত চাই। কিন্তু আস্তে ভাই—ব্যাটারা ভারি পাজী! আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে মক্কা ক্ষেতের ভেতর দিয়ে এম্‌নি বার ক'রে নিয়ে যাবো যে, শালারা টেরও পাবে না। একটু হাসিয়া কহিল, আর টের পেলেই বা কি? ধরা কি মুখের কথা! ছাখ শ্রীকান্ত, কিচ্ছু ভয় নেই—ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে—কিন্তু, যদি দেখিস্ ঘিরে ফেল্‌লে ব'লে—আর পালাবার যো নেই, তখন ঝুপ্ ক'রে লাফিয়ে প'ড়ে একডুবে যতদূর পারিস্ গিয়ে ভেসে উঠলেই হ'ল। এ অন্ধকারে আর দেখবার জো-টি নেই—তারপর মজা ক'রে সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোরবেলায় সাঁতরে এপারে এসে গঙ্গার ধারে-ধারে বাড়ী ফিরে গেলেই বাস্! কি করবে ব্যাটারা?

চড়াটার নাম শুনিয়াছিলাম; কহিলাম, সতুয়ার চড়া ত ঘোরনালার সুমুখে, সে ত অনেক দূর!

ইন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে কহিল, কোথায় অনেক দূর? ছ-সাত কোশও হবে না বোধ হয়। হাত ভেরে গেলে চিৎ হয়ে থাকলেই হ'ল। তা ছাড়া মড়া-পোড়ানো বড়-বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখতে পাবি।

আত্মরক্ষার যে সোজা রাস্তা সে দেখাইয়া দিল, তাহাতে প্রতিবাদের আর কিছু রহিল না। এই দিক্-চিহ্নহীন অন্ধকার নিশীথে আবর্ত্তসঙ্কুল গভীর তীব্র জলপ্রবাহে সাতক্রোশ ভাসিয়া গিয়া ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা। ইহার মধ্যে আর এ দিকের তীরে উঠিবার জো নাই। দশ-পনেব হাত খাড়া উঁচু বালির পাড় মাথায় ভাঙিয়া পড়িবে—এই দিকেই গঙ্গার ভীষণ ভাঙন ধরিয়া জলস্রোত অর্দ্ধবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে!

বস্তুটা অস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াই আমার বীর-হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ দাঁড় টানিয়া বলিলাম, কিন্তু আমাদের ডিঙির কি হবে?

ইন্দ্র কহিল, সেদিন ত আমি ঠিক এমনি ক'রেই পালিয়েছিলাম। তার

পরদিন এসে ডিঙি কেড়ে নিয়ে গেলাম—বল্‌লাম, নৌকা ঘাট থেকে চুরি ক'রে আর কেউ এনেছিল—আমি নয়।

তবে এ-সকল এর কল্পনা নয়—একেবারে হাতে-নাতে প্রত্যক্ষ-করা সত্য! ক্রমশঃ ডিঙি খাঁড়ির সম্মুখীন হইলে দেখা গেল, জেলেদের নৌকা-গুলি সারি দিয়া খাঁড়ির মুখে বাঁধা আছে—মিট্-মিট্ করিয়া আলো জ্বলিতেছে। দুইটি চড়ার মধ্যবর্ত্তী এই জলপ্রবাহটা খালের মত হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। ঘুরিয়া তাহার অপর পারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে-স্থানটায় জলের বেগে অনেকগুলা মোহানার মত হইয়াছে এবং সব কয়টাকেই বুনো ঝাউগাছে একটা হইতে আর একটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। একটার ভিতর দিয়া খানিকটা বাহিয়া গিয়াই আমরা খালের মধ্যে পড়িলাম। জেলেদের নৌকাগুলা তখন অনেকটা দূরে কালো কালো ঝোপের মত দেখাইতেছে। আর খানিকটা অগ্রসর হইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো গেল।

ধীবর-প্রভুরা খালের সিংহদ্বার আগুলিয়া আছে মনে করিয়া এ স্থানটায় পাহারা রাখে নাই। ইহাকে মায়াজাল বলে। খালে যখন জল থাকে না, তখন এ-ধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত উঁচু উঁচু কাঠি শক্ত করিয়া পুঁতিয়া দিয়া তাহারই বহির্দ্দিকে জাল টাঙাইয়া রাখে। পরে বর্ষার জলস্রোতে বড়-বড় রুই-কাতলা ভাসিয়া আসিয়া এই কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া এ দিকে পড়িতে চায় এবং দড়ির জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

দশ, পনের, বিশ সের রুই-কাতলা গোটা পাঁচ-ছয় ইন্দ্র চক্ষের নিমিষে নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। সেই বিরাটকায় মৎস্যরাজেরা তখন পুচ্ছতাড়নায় ক্ষুদ্র ডিঙিখানা যেন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল এবং তাহার শব্দও বড় কম হইল না।

এত মাছ কি হবে ভাই?

কাজ আছে। আর না, পালাই চল্। বলিয়া সে জাল ছাড়িয়া দিল। আর দাঁড় টানিবার প্রয়োজন নাই। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তখন, তেমনি গোপনে আবার সেই পথেই বাহির হইতে হইবে। অনুকূল স্রোতে মিনিট দুই-তিন খরবেগে ভাটাইয়া আসিয়া হঠাৎ একস্থানে একটা

দমক্ মারিয়া যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ডিঙিটি পাশের ভুট্টা-ক্ষেতের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক গতি-পরিবর্ত্তনে আমি চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি? কি হ'ল?

ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল, চুপ্। শালারা টের পেয়েছে—চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এদিকে আস্‌চে—ঐ ছ্যাখ্। তাই ত বটে! প্রবল জলতাড়নায় ছপাছপ্ শব্দ করিয়া তিনখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে। ওদিকে জাল দিয়া বন্ধ, সুমুখে ইহারা—পালাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার এতটুকু স্থান নাই। এই ভুট্টা-ক্ষেতের মধ্যেই যে আত্মগোপন করা চলিবে, তাহাও সম্ভব মনে হইল না।

কি হবে ভাই?—বলিতে বলিতেই অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে আমার কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া গেল। এই অন্ধকারে এই ফাঁদের মধ্যে খুন করিয়া এই ক্ষেতের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিলেই বা কে নিবারণ করিবে?

ইতিপূর্ব্বে পাঁচ-ছয় দিন ইন্দ্র 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা' সপ্রমাণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে, এতদিন ধরা পড়িয়াও পড়ে নাই, কিন্তু আজ?

সে মুখে একবার বলিল, ভয় নেই। কিন্তু গলাটা তাহার যেন কাঁপিয়া গেল। কিন্তু সে থামিল না। প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া ক্রমাগত ভিতরে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত চড়াটা জলে জলময়। তাহার উপর আট-দশ হাত দীর্ঘ ভুট্টা এবং জনারের গাছ। ভিতরে এই দুটি চোর। কোথাও জল এক বুক, কোথাও এক কোমর, কোথাও হাঁটুর অধিক নয়। উপরে নিবিড় অন্ধকার, সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। পাঁকে লগি পুঁতিয়া যাইতে লাগিল, নৌকা আর এক-হাতও অগ্রসর হয় না। পিছন হইতে জেলেদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসিতে লাগিল। কিছু একটা সন্দেহ করিয়াই যে তাহারা আসিয়াছে এবং তখনও খুঁজিয়া ফিরিতেছে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।

সহসা নৌকাটা একটু কাৎ হইয়াই সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সভয়ে ডাকিলাম, ইন্দ্র! হাত পাঁচ-ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, আমি নীচে।

নীচে কেন ?

ডিঙি টেনে বার কর্‌তে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।

টেনে কোথায় বার কর্‌বে ?

ও গঙ্গায়। খানিকটা যেতে পার্‌লেই বড় গাঙে পড়বে।

শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ক্রমশঃ ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অকস্মাৎ কিছুদূরে বনের মধ্যে ক্যানাস্ত্রা-পিটানো ও চেরা-বাঁশের কটাকট্ শব্দে চম্‌কাইয়া উঠিলাম। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কি ভাই ?

সে উত্তর দিল, চাষীরা মাচার উপর ব'সে বুনো শূয়ার তাড়াচ্ছে।

বুনো শূয়ার ! কোথায় সে ?

ইন্দ্র নৌকা টানিতে-টানিতে তাচ্ছিল্যভরে কহিল, আমি কি দেখতে পাচ্ছি যে বোল্‌ব ? আছেই কোথাও এইখানে।

জবাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম. ভাবিলাম, কা'র মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল ! সন্ধ্যারাত্রে আজই ঘরের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িয়াছিলাম। এ জঙ্গলে যে বুনো শূয়ারের হাতে পড়িব, তাহার বিচিত্র কি ! তথাপি আমি ত নৌকায় বসিয়া ; কিন্তু ঐ লোকটি এক-বুক কাদা ও জলের মধ্যে এই বনের ভিতরে। এক-পা নড়িবার চড়িবার উপায় পর্য্যন্ত তাহার নাই। মিনিট পনের এইভাবে কাটিল ! আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক-একটা জনার বা ভুট্টা-গাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া 'ছপাৎ' করিয়া শব্দ হইতেছে। একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। সশঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধাড়ী শূয়ার না হইলেও বাচ্চা-টাচ্ছা নয় ত ?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে ; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

কিছু না—সাপ ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম, কি সাপ ভাই ?

ইন্দ্র কহিল, সব রকম আছে। ঢোঁড়া, বোড়া, গোখরো, করেত—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে— কোথাও ডাঙা নেই দেখ্‌চিস্‌নে ?

সে ত দেখছি। কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল। সে লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে-করিতে বলিতে লাগিল—কিন্তু কামড়ায় না। ওরা নিজেরাই ভয়ে মর্‌চে—দুটো-তিনটে ত আমার গা-ঘেঁসে পালালো। এক-একটা মস্ত বড়—সেগুলো বোড়া-ঢোঁড়া হবে বোধ হয়। আর কাম্‌ড়ালেই বা কি কর্‌ব! মর্‌তে একদিন ত হবেই ভাই! এমনি আরও কত কি সে মৃদু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে বলিতে চলিল, আমার কানে কতক পৌঁছিল, কতক পৌঁছিল না। আমি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া এক-স্থানে একভাবে বসিয়া রহিলাম। নিঃশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল—ছপাৎ করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে!

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি! যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে, সেকথা কি ও জানেও না! বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরী? সেটা কি আমাদের মত সঙ্কুচিত বিস্ফারিত হয় না? তবে যে সেদিন মাঠের মধ্যে সকলে পালাইয়া গেলে, সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্ব্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দয়ামায়াও কি ওই পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল! আর আজ? সমস্ত বিপদের বার্ত্তা তন্ন-তন্ন করিয়া জানিয়া শুনিয়া নিঃশব্দে অকুণ্ঠিত-চিত্তে এই ভয়াবহ, অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া দাঁড়াইল; একবার একটা মুখের অনুরোধও করিল না—'শ্রীকান্ত, তুই একবার নেমে যা'। সে ত জোর করিয়াই আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা টানিতে পারিত। এ ত শুধু খেলা নয়! জীবন্মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে? ঐ যে বিনা আড়ম্বরে সামান্যভাবে বলিয়াছিল, 'মর্‌তে একদিন ত হবেই', এমন সত্য কথা বলিতে কয়টা মানুষকে দেখা যায়? সে-ই আমাকে এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে সত্য, কিন্তু সে যাই হোক, তাহার এত বড় স্বার্থত্যাগ আমি মানুষের দেহ ধরিয়া ভুলিয়া যাই কেমন করিয়া? কেমন করিয়া ভুলি, যাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে এত বড় অযাচিত দান এতই

সহজে বাহির হইয়া আসিল—সে হৃদয় কি দিয়া কে গড়িয়া দিয়াছিল! তার পরে কত কাল কত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া আজ এই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি; কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বত বন-জঙ্গল ঘাটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু, এত বড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও দেখিতে পাই নাই। কিন্তু সে আর নাই। অকস্মাৎ একদিন বুদ্‌বুদের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। আজ মনে পড়িয়া এই দুটো শুষ্ক চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে—কেবল একটা নিষ্ফল অভিমান হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করিয়া উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠিতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তা! এই অদ্ভুত অপার্থিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলে এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার করিলে! বড় ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আজ বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে—ভগবান্! টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত, বিদ্যা-বুদ্ধি ঢের ত তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি; কিন্তু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আজ পর্য্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে?

যাক্ সে কথা। ক্রমশঃ ঘোর জল-কল্লোল নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতেছিলাম; অতএব আর প্রশ্ন না করিয়াই বুঝিলাম, এই বনান্তরালেই সেই ভীষণ প্রবাহ—যাহাকে অতিক্রম করিয়া স্টীমার যাইতে পারে না—তাহাই প্রধাবিত হইতেছে। বেশ অনুভব করিতেছিলাম, জলের বেগ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং ধূসর ফেনপুঞ্জ বিস্তৃত বালুকারাশির ভ্রমোৎপাদন করিতেছে। ইন্দ্র আসিয়া নৌকায় উঠিল এবং বোটে হাতে করিয়া সম্মুখবর্ত্তী উদ্দাম স্রোতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিল। কহিল, আর ভয় নেই; বড় গাঙে এসে পড়েচি। মনে-মনে কহিলাম, ভয় না থাকে ভালই। কিন্তু, কিসে যে তোমার ভয় আছে, তাও বুঝিলাম না। পরক্ষণেই সমস্ত নৌকাটা আপাদমস্তক একবার যেন শিহরিয়া উঠিল এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই দেখিলাম, তাহা বড় গাঙের স্রোত ধরিয়া উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তখন ছিন্ন-ভিন্ন মেঘের আড়ালে বোধ করি যেন চাঁদ উঠিতেছিল। কারণ, যে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম, সে অন্ধকার আর ছিল না। এখন অনেক দূর পর্য্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম,

বন-ঝাউ এবং ভুট্টা-জনারের চড়া ডানদিকে রাখিয়া নৌকা আমাদের সোজা চলিতে লাগিল।

তিন

বড় ঘুম পেয়েছে, ইন্দ্র, বাড়ী ফিরে চল না, ভাই।

ইন্দ্র একটুখানি হাসিয়া ঠিক যেন মেয়েমানুষের মত স্নেহার্দ্র কোমল স্বরে কথা কহিল, বলিল ঘুম ত পাবার কথাই ভাই। কি করব শ্রীকান্ত, আজ একটু দেরী হবেই— অনেক কাজ রয়েছে। আচ্ছা, এক কাজ কর্ না কেন। ঐখানে একটু শুয়ে ঘুমিয়ে নে না?

আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিতে হইল না। আমি গুটিশুটি হইয়া সেই তক্তাখানির উপর শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুম আসিল না। স্তিমিতচক্ষে চুপ করিয়া আকাশের গায়ে মেঘ ও চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখিতে পাইলাম। ঐ ডোবে, ওই ভাসে, আবার ডোবে, আবার ভাসে। আর কানে আসিতে লাগিল—জলস্রোতের সেই একটানা হুঙ্কার। আমার একটা কথা প্রায়ই মনে পড়ে। সেদিন অমন করিয়া সব ভুলিয়া মেঘ আর চাঁদের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলাম কি করিয়া? সে ত আমার তন্ময় হইয়া চাঁদ দেখিবার বয়স নয়। কিন্তু ওই যে বুড়োরা পৃথিবীর অনেক ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া বলে যে, ঐ বাহিরের চাঁদটাও কিছু না, মেঘটাও কিছু না—সব ফাঁকি, সব ফাঁকি! আসল যা' কিছু তা এই নিজের মনটা! সে যখন যাকে যা দেখায়, বিভোর হয়ে সে তখন তাই শুধু দেখে। আমারও সেই দশা। এত রকমের ভয়ঙ্কর ঘটনার ভিতর দিয়া এমন নিরাপদে বাহির হইয়া আসিতে পারিয়া, আমার নির্জ্জীব মনটা তখন বোধ করি এমনি-কিছু-একটা শান্ত ছবির অন্তরেই বিশ্রাম করিতে চাহিয়াছিল।

ইতিমধ্যে যে ঘণ্টা-দুই কাটিয়া গেছে, তাহা টেরও পাই নাই। হঠাৎ মনে হইল আমার, চাঁদ যেন মেঘের মধ্যে একটা লম্বা ডুব-সাঁতার দিয়া

একেবারে ডানদিক হইতে বাঁদিকে গিয়া মুখ বাহির করিলেন। ঘাড়টা একটু তুলিয়া দেখিলাম, নৌকা এবার ওপারে পাড়ি দিবার আয়োজন করিয়াছে। প্রশ্ন করিবার বা একটা কথা কহিবার উদ্যমও তখন বোধ করি আমার মধ্যে ছিল না; তাই তখনি আবার তেমনি করিয়াই শুইয়া পড়িলাম। আবার সেই দু'চক্ষু ভরিয়া চাঁদের খেলা এবং দু'কান ভরিয়া স্রোতের তর্জ্জন। বোধ করি, আরও ঘণ্টাখানেক কাটিল।

খস্—স্—বালুর চরে নৌকা বাঁধিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। এই যে এপারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিন্তু এ কোন্ জায়গা? বাড়ী আমাদের কত দূরে? বালুকার রাশি ভিন্ন আর কিছুই ত কোথাও দেখি না? প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই হঠাৎ নিকটেই কোথায় যেন কুকুরের কলহ শুনিতে পাইয়া আরও সোজা হইয়া বসিলাম। কাছেই লোকালয় আছে নিশ্চয়।

ইন্দ্র কহিল, একটু বোস্, শ্রীকান্ত; আমি এখ্খুনি ফিরে আসব—তোর কিচ্ছু ভয় নেই। এই পাড়ের ওধারেই জেলেদের বাড়ী।

সাহসের এতগুলো পরীক্ষায় পাশ করিয়া শেষে এইখানে আসিয়া ফেল করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ মানুষের এই কিশোর বয়সটার মত এমন মহাবিস্ময়কর বস্তু বোধ করি সংসারে আর নাই। এম্‌নিই ত সর্ব্বকালেই মানুষের মানসিক গতিবিধি বড়ই দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু কিশোর-কিশোরীর মনের ভাব, বোধ করি, একেবারেই অজ্ঞেয়; তাই বোধ করি শ্রীবৃন্দাবনের সেই দুটি কিশোর-কিশোরীর কৈশোরলীলা চিরদিনই এমন রহস্যে আবৃত হইয়া রহিল। বুদ্ধি দিয়া তাহাকে ধরিতে না পারিয়া তাহাকে কেহ কহিল ভালো, কেহ কহিল মন্দ—কেহ নীতির, কেহ বা রুচির দোহাই পাড়িল—আবার কেহবা কোন কথাই শুনিল না—তর্কাতর্কির সমস্ত গণ্ডি মাড়াইয়া ডিঙাইয়া বাহির হইয়া গেল। যাহারা গেল, তাহারা মজিল, পাগল হইয়া, নাচিয়া কাঁদিয়া গান গাহিয়া, সব একাকার করিয়া দিয়া, সংসারটাকে যেন একটা পাগলাগারদ বানাইয়া ছাড়িল। তখন যাহারা মন্দ বলিয়া গালি পাড়িল, তাহারাও কহিল, এমন রসের উৎস কিন্তু আর কোথাও নাই। যাহাদের রুচির সহিত মিশ

খায় নাই, তাহারাও স্বীকার করিল—এই পাগলের দলটি ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কোথাও শুনিলাম না।

কিন্তু এত কাণ্ড যাহাকে আশ্রয় করিয়া ঘটিল,—সেই যে সর্ব্বদিনের পুরাতন, অথচ চিরনূতন বৃন্দাবনের বনে-বনে ছুটি কিশোর-কিশোরীর অপরূপ লীলা—বেদান্ত যাহার কাছে ক্ষুদ্র,—মুক্তিফল যাহার তুলনায় বারীশের কাছে বারিবিন্দুর মতই তুচ্ছ,—তাহার কে কবে অন্ত খুঁজিয়া পাইল? পাইল না, পাওয়াও যায় না। তাই বলিতেছিলাম, তেম্নি সেও ত আমার সেই কিশোর বয়স! যৌবনের তেজ এবং দৃঢ়তা না আসুক, তাহার দম্ভ ত তখন আসিয়া হাজির হইয়াছে। প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা ত হৃদয়ে সজাগ হইয়াছে! তখন সঙ্গীর কাছে ভীরু বলিয়া কে নিজেকে প্রতিপন্ন করিতে চাহে? অতএব তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, ভয় কর্‌ব আবার কিসের? বেশ ত, যাও না। ইন্দ্র আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া দ্রুতপদে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

উপরে, মাথার উপরে আবার সেই আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা এবং পশ্চাতে বহুদূরাগত সেই অবিশ্রান্ত তর্জ্জন। আর সুমুখে সেই বালির পাড়। এটা কোন্ জায়গা, তাহাই ভাবিতেছি, দেখি—ইন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, শ্রীকান্ত, তোকে একটা কথা বলতে ফিরে এলুম। কেউ যদি মাছ চাইতে আসে, খবরদার দিস্‌নে—খবরদার ব'লে দিচ্ছি। ঠিক আমার মত হয়েও যদি কেউ আসে, তবু দিবিনে—বল্‌বি, মুখে তোর ছাই দেবো—ইচ্ছে হয়, নিজে তুলে নিয়ে যা। খবরদার, হাতে করে দিতে যাস্‌নে যেন—ঠিক আমি হ'লেও না—খবরদার!

কেন ভাই?

ফিরে এসে বল্‌ব—খবরদার কিন্তু—বলিতে-বলিতে সে যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল, তেমনি ছুটিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

এইবার আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন দেহের প্রতি শির-উপশিরা দিয়া বরফগলা জল বাহিয়া চলিতে লাগিল। নিতান্ত শিশুটি নহি যে, তাহার ইঙ্গিতের মর্ম্ম অনুমান করিতে পারি নাই। আমার জীবনে এমন অনেক

ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, যাহার তুলনায় ইহা সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের জল। কিন্তু তথাপি, এই নিশা-অভিযানের রাতটায় যে ভয় অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বোধ করি, ভয়ে চৈতন্য হারাইবার ঠিক শেষ ধাপটিতে আসিয়াই পা দিয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল, পাড়ের ওদিক্ হইতে কে যেন উঁকি মারিয়া দেখিতেছে! যেম্নি আড়চোখে চাই, অম্নি সেও মাথা নীচু করে।

সময় আর কাটে না। ইন্দ্র যেন কত যুগ হইল চলিয়া গিয়াছে—আর ফিরিতেছে না।

মনে হইল, যেন মনুষ্য-কণ্ঠস্বর শুনিলাম। পৈতাটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে শতপাকে বেষ্টন করিয়া মুখ নীচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইলে বেশ বুঝিলাম, দুই-তিনজন লোক কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে এইদিকে আসিতেছে। একজন ইন্দ্র এবং আর দুইজন হিন্দুস্থানী। কিন্তু সে যাহা হোক, তাহাদের মুখের দিকে চাহিবার আগে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, চন্দ্রালোকে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে কি না। কারণ—এই অবিসংবাদী সত্যটা ছেলেবেলা হইতেই জানিতাম যে, ইহাদের ছায়া থাকে না।

আঃ—ঐ যে ছায়া! অস্পষ্ট হউক, তবুও ছায়া! জগতে আমার মত সেদিন কোন মানুষ কোন বস্তু চোখে দেখিয়া কি এমন তৃপ্তি পাইয়াছে! পাক্ আর নাই পাক্, ইহাকেই যে বলে দৃষ্টির চরম আনন্দ, এ-কথা আজ আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। যাক্। যাহারা আসিল, তাহারা অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত সেই বৃহদায়তন মাছগুলি নৌকা হইতে তুলিয়া জালের মত একপ্রকার বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তৎপরিবর্ত্তে ইন্দ্রের হাতে যাহা গুঁজিয়া দিল, তাহার একটা টুং করিয়া একটুখানি মৃদু-মধুর শব্দ করিয়া নিজেদের পরিচয়টাও আমার কাছে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া গেল না।

ইন্দ্র নৌকা খুলিয়া দিল, কিন্তু স্রোতে ভাসাইল না। ধার ঘেঁসিয়া প্রবাহের প্রতিকূলে লগি ঠেলিয়া ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমি কোন কথা কহিলাম না। কারণ, আমার মন তখন তাহার

বিরুদ্ধে ঘৃণায় ও কি এক প্রকারের অভিমানে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এইমাত্র না তাহাকেই চাঁদের আলোয় ছায়া ফেলিয়া ফিরিতে দেখিয়া অধীর-আনন্দে ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম!

হাঁ, তা' মানুষের স্বভাবই ত এই! একটুখানি দোষ পাইলে পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তের সমস্তই নিঃশেষে ভুলিয়া যাইতে তাহার কতক্ষণ লাগে? ছিঃ! ছিঃ! এম্‌নি করিয়া সে টাকা সংগ্রহ করিল! এতক্ষণ এই মাছ-চুরি ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে বেশ স্পষ্ট চুরির আকারে বোধ করি স্থান পায় নাই। কেন না, ছেলেবেলায় টাকা-কড়ি চুরিটাই শুধু যেন বাস্তবিক চুরি, আর সব অন্যায় বটে—কিন্তু, কেমন করিয়া যেন সে-সব ঠিক চুরি নয়—এমনিই একটা অদ্ভুত ধারণা প্রায় সকল ছেলেরই থাকে। আমারও তাই ছিল। না হইলে এই 'টু' শব্দটি কানে যাইবামাত্রই এতক্ষণের এত গৌরব, এত পৌরুষ, সমস্তই একমুহূর্ত্তে এমন শুষ্ক তৃণের মত ঝরিয়া পড়িত না। সে যদি মাছগুলা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিত, কিংবা—আর যাহা করুক, শুধু টাকা-কড়ির সহিত ইহার সংস্রব না ঘটাইত, তাহা হইলে আমাদের এই মৎস্য-সংগ্রহের অভিযানটিকে কেহ চুরি বলিলে, ক্রোধে বো[illegible] রি তাহার মাথাটাই ফাটাইয়া দিতাম এবং সে তাহার ন্যায্য প্রাপ[illegible] [illegible]ইয়াছে বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু, ছিঃ ছিঃ! এ কি! এ কাজ [illegible] [illegible]লখানার কয়েদীরা করে!

ইন্দ্র কথা কহিল, জিজ্ঞাসা করিল, তুই একটুও ভয় পাস্‌নি, না [illegible] [illegible]কান্ত?

আমি সংক্ষেপে জবাব দিলান,—না!

ইন্দ্র কহিল, কিন্তু তুই ছাড়া ওখানে আর কেউ ব'সে থাক্‌তে পার[illegible] [illegible], তা জানিস্? তোকে আমি খুব ভালবাসি—আমার এমন বন্ধ[illegible] [illegible]র একটিও নেই। আমি যখন আস্‌ব তোকে শুধু ডেকে আন্‌ব [illegible]মন?

আমি জবাব দিলাম না। কিন্তু এই সময়ে তাহার মুখের উপর স[illegible] [illegible]মুক্ত যে চাঁদের আলোটুকু পড়িল, তাহাতে মুখখানি কি যে দেখাইল

আমি এতক্ষণের সব রাগ-অভিমান হঠাৎ ভুলিয়া গেলাম। জিজ্ঞাস করিলাম, আচ্ছা ইন্দ্র, তুমি কখনও ঐ-সব দেখেছ ?

কি সব ?

ঐ যারা মাছ চাইতে আসে ?

না ভাই, দেখিনি—লোকে বলে, তাই শুনেছি !

আচ্ছা, তুমি এখানে একলা আসতে পারো ?

ইন্দ্র হাসিল। কহিল, আমি ত একলাই আসি।

ভয় করে না ?

না। রামনাম করি। কিছুতে তারা আস্‌তে পারে না। একটু থামিয়া কহিল, রামনাম কি সোজা রে ? তুই যদি রামনাম করতে-করতে সাপের মুখ দিয়ে চ'লে যাস্, তবু তোর কিছু হবে না। সব দেখবি, ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে পালাবে। কিন্তু ভয় কর্‌লে হবে না। তা হ'লেই তারা টের পাবে, এ শুধু চালাকি কর্‌চে—তারা সব অন্তর্য্যামী কি না !

বালুর চর শেষ হইয়া আবার কাঁকরের পাড় সুরু হইল। ওপার অপেক্ষা এপারে স্রোত অনেক কম। বরঞ্চ এইখানটায় বোধ হইল স্রোত যেন উল্টোমুখে চলিয়াছে। ইন্দ্র লগি তুলিয়া বোটে হাতে করিয়া কহিল, ঐ যে সামনে বনের মত দেখাচ্ছে, আমাদের ওর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ঐখানে আমি একবার নেবে যাবো। যাবো আর আসব কেমন ?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিলাম, আচ্ছা। কারণ, 'না' বলিবার পথ ত এক-প্রকার নিজেই বন্ধ করিয়া দিয়াছি ! আবার ইন্দ্রও আমার নির্ভীকতা সম্বন্ধে বোধ করি নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কিন্তু কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এখান হইতে ঐ স্থানটা এম্‌নি জঙ্গলের মত অন্ধকার দেখাইতেছিল যে, এইমাত্র রামনামের অসাধারণ মাহাত্ম্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও ওই অন্ধকার প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে নৌকার উপর একা বসিয়া এত রাত্রে রামনামের শক্তি-সামর্থ্য যাচাই করিয়া লইতে আমার এতটুকু প্রবৃত্তি হইল না এ তখন হইতে গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। সত্য বটে, মাছ আর ছিল না সুতরাং মৎস্য-প্রার্থীদের শুভাগমন না হইতে পারে, কিন্তু সকলের ...

যে মাছেরই উপর, তাই বা কে বলিল? মানুষের ঘাড় মটকাইয়া ঈষদুষ্ণ রক্তপান এবং মাংস-চর্ব্বণের ইতিহাসও ত শোনো গিয়াছে।

অনুকূল স্রোতে এবং বোটের তাড়নায় ডিঙিখানি তর্ তর্ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। আরও কিছুদূর আসিতেই দক্ষিণদিকের আগ্রীবমগ্ন বনঝাউ এবং কসাড় বন মাথা তুলিয়া, এই দুটি অসমসাহসী মানবশিশুর পানে বিস্ময়স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল এবং কেহ বা মাঝে মাঝে শিরশ্চালনে কি যেন নিষেধ জানাইতে লাগিল। বামদিকেও তাহাদের আত্মীয়-পরিজনেরা সু-উচ্চ কাঁকরের পাড় সমাচ্ছন্ন করিয়া তেম্‌নি করিয়াই চাহিয়া রহিল এবং তেম্‌নি করিয়া মানা করিতে লাগিল। আমি একা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের সঙ্কেত অমান্য করিতাম না। কিন্তু কর্ণধার যিনি, তাঁহার কাছে বোধ করি এক 'রাম' নামের জোরেই ইহাদের সমস্ত আবেদন-নিবেদন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপই করিল না। দক্ষিণদিকের চরের বিস্তৃতি বশতঃ এ জায়গাটা একটি ছোট-খাটো হ্রদের মত হইয়াছিল—শুধু উত্তরদিকের মুখ খোলা ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, ডিঙি বেঁধে উপরে উঠবার ত ঘাট নেই, তুমি যাবে কি ক'রে?

ইন্দ্র কহিল, ঐ যে বটগাছ; ওর পাশেতেই একটা সরু ঘাট আছে।

কিছুক্ষণ হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে নাকে আসিয়া লাগিতেছিল। যত অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই সেটা বাড়িতেছিল। এখন হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাসের সঙ্গে সেই দুর্গন্ধটা এমন বিকট হইয়া নাকে লাগিল যে, অসহ্য বোধ হইল। নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিলাম—নিশ্চয় কি পচেছে ইন্দ্র।

ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কিনা। সবাই ত পোড়াতে পারে না—মুখে একটুখানি আগুন ছুঁইয়ে ফেলে দিয়ে যায়। শিয়াল-কুকুরে খায় আর পচে। তারই অত গন্ধ।

কোন্‌খানে ফেলে দিয়ে যায় ভাই?

ওই হোথা থেকে হেথা পর্য্যন্ত—সবটাই শ্মশান কিনা। যেখানে হোক ফেলে রেখে, ঐ বটতলার ঘাটে চান ক'রে বাড়ী চ'লে যায়,—আরে

দূর! ভয় কিরে! ও শিয়ালে-শিয়ালে লড়াই কর্‌চে।—আচ্ছা, আয়, আয়, আমার কাছে এসে বোস্‌।

আমার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না—কোনমতে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কোলের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। সে ক্ষণকালের জন্য আমাকে একবার স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় কি শ্রীকান্ত? কত রাত্তিরে একা আমি এই পথে যাই আসি---তিনবার রামনাম কর্‌লে কার সাধ্যি কাছে আসে?

তাহাকে স্পর্শ করিয়া দেহটাতে যেন একটু সাড়া পাইলাম—অস্ফুটে কহিলাম—না ভাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এখানে কোথাও নেবো না—সোজা বেরিয়ে চল।

সে আবার আমার কাঁধে হাত ঠেকাইয়া বলিল, না শ্রীকান্ত, একটিবার যেতেই হবে। এই টাকা ক'টি না দিলেই নয়—তারা পথ চেয়ে ব'সে আছে—আমি তিন দিন আস্‌তে পারিনি।

টাকা কা'ল দিয়ো না ভাই!

না ভাই, অমন কথাটি বলিস্‌নে। আমার সঙ্গে তুইও চল্‌—কিন্তু কাকুকে একথা বলিস্‌নে যেন।

আমি অস্ফুটে 'না' বলিয়া তাহাকে তেম্‌নি স্পর্শ করিয়া, পাথরের মত বসিয়া রহিলাম। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল কিন্তু হাত বাড়াইয়া জল লইব, কি নড়া-চড়ার কোন প্রকার চেষ্টা করিব, এ সাধ্যই আমার ছিল না।

গাছের ছায়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায়, অদূরেই সেই ঘাটটি চোখে পড়িল যেখানে আমাদের অবতরণ করিতে হইবে, তাহার উপরে যে গাছপালা নাই, স্থানটি ম্লান জ্যোৎস্নালোকেও বেশ আলোকিত হইয়া আছে,—দেখিয়া অত দুঃখেও একটু আরাম বোধ করিলাম। ঘাটের কাঁকরে ডিঙি ধাক্কা না খায়, এই জন্য ইন্দ্র পূর্ব্বাহ্ণেই প্রস্তুত হইয়া মুখের কাছে সরিয়া আসিল এবং লাগিতে-না-লাগিতে লাফাইয়া পড়িয়াই একটা ভয়জড়িত স্বরে 'ইস্‌' করিয়া উঠিল। আমিও তাহার পশ্চাতেই ছিলাম, সুতরাং উভয়েই প্রায় এক সময়েই সেই বস্তুটির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম। তবে সে নীচে, আমি নৌকার উপরে।

অকাল-মৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণ-ভাবে আমার চোখে পড়ে নাই। ইহা যে কত বড় হৃদয়-ভেদী ব্যথার আধার, তাহা তেমন করিয়া না দেখিলে বোধ করি দেখাই হয় না। গভীর নিশীথে চারিদিক্ নিবিড় স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ। শুধু মাঝে-মাঝে ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে শ্মশানচারী শৃগালের ক্ষুধার্ত্ত কলহ-চীৎকার, কখন বা বৃক্ষোপবিষ্ট অৰ্দ্ধসুপ্ত বৃহৎকায় পক্ষীর পক্ষতাড়ন-শব্দ, আর বহুদূরাগত তীব্র জলপ্রবাহের অবিশ্রাম হু-হু-হু আর্ত্তনাদ—ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ হইয়া, এই মহাকরুণ দৃশ্যটির পানে চাহিয়া রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ ছয়-সাত বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট বালক—তাহার সর্ব্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি ঘাটের উপর। শৃগালেরা বোধ করি জল হইতে তাহাকে এইমাত্র তুলিতেছিল, শুধু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। খুব সম্ভব তিন-চারি ঘণ্টার অধিক তাহার মৃত্যু হয় নাই। ঠিক যেন বিসূচিকার নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়া সে বেচারা মা-গঙ্গার কোলের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা অতি সন্তর্পণে তাহার সুকুমার নশ্বর দেহটিকে এইমাত্র কোল হইতে বিছানায় শোয়াইয়া দিতেছিলেন। জলে-স্থলে-বিন্যস্ত এমনিভাবেই সেই ঘুমন্ত শিশু-দেহটির উপর সেদিন আমাদের চোখ পড়িয়াছিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দ্রের দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কহিল, তুই একটু স'রে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আমি ও-বেচারাকে ডিঙিতে তুলে ঐ চড়ার ঝাউবনের মধ্যে ফেলে রেখে আসি।

চোখের জল দেখিবামাত্র আমার চোখেও জল আসিতেছিল সত্য, কিন্তু ছোঁয়া-ছুঁয়ির প্রস্তাবে আমি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। পরদুঃখে ব্যথা পাইয়া চোখের জল ফেলা সহজ নহে, তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাই বলিয়া সেই দুঃখের মধ্যে নিজের দুই হাত বাড়াইয়া আপনাকে জড়িত করিতে যাওয়া—সে ঢের-ঢের কঠিন কাজ! তখন ছোট-বড় কত জায়গাতেই না টান ধরে। একে ত এই পৃথিবীর সেরা সনাতন হিন্দুর ঘরে বশিষ্ঠ ইত্যাদির পবিত্র পূজ্য রক্তের বংশধর হইয়া জন্মিয়া, জন্মগত সংস্কারবশতঃ মৃতদেহ স্পর্শ করাকেই একটা ভীষণ

কঠিন ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, ইহাতে কতই না শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বাঁধা-বাঁধি,—কতই না রকমারি কাণ্ডের ঘটা। তাহাতে, এ কোন্ রোগের মড়া, কাহার ছেলে, কি জাত—কিছুই না জানিয়া এবং মরিবার পর এ ছোক্‌রা ঠিকমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল কি না, সে খবরটা পর্য্যন্ত না লইয়াই বা ইহাকে স্পর্শ করা যায় কিরূপে ?

কুণ্ঠিত হইয়া তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জাতের মড়া—তুমি ছোঁবে ? ইন্দ্র সরিয়া আসিয়া এক হাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অন্য হাত হাঁটুর নীচে দিয়া, একটা শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া কহিল, নইলে বেচারাকে শিয়ালে ছেঁড়া-ছিঁড়ি ক'রে খাবে। আহা ! মুখে এখনো এর ওষুধের গন্ধ পর্য্যন্ত রয়েছে রে ! বলিয়া নৌকার যে তক্তাখানির উপর ইতিপূর্ব্বে আমি শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহারই উপর শোয়াইয়া নৌকা ঠেলিয়া দিয়া নিজেও চড়িয়া বসিল। কহিল, মড়ার কি জাত থাকে রে ?

আমি তর্ক করিলাম, কেন থাকবে না ?

ইন্দ্র কহিল, আরে, এ যে মড়া ! মড়ার আবার জাত কি ? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা—এর কি জাত আছে ? আম-গাছ জাম-গাছ যে কাঠেরই তৈরী হোক্‌—এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বল্‌বে না—আম-গাছ জাম-গাছ - বুঝলি না ? এও তেম্‌নি।

দৃষ্টান্তটি যে নেহাৎ ছেলেমানুষেরই মত, এখন তাহা জানি কিন্তু অন্তরের মধ্যে ইহাও ত অস্বীকার করিতে পারি না—কোথায় যেন অতি তীক্ষ্ণ সত্য ইহারই মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। মাঝে মাঝে এম্‌নি খাঁটি কথা সে বলিতে পারিত। তাই আমি অনেক সময় ভাবিয়াছি, এই বয়সে কাহারোও কাছে কিছুমাত্র শিক্ষা না করিয়া, বরঞ্চ প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া, এই সকল তত্ত্ব সে পাইত কোথায় ? এখন কিন্তু বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে ইহার উত্তরটাও যেন পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। কপটতা ইন্দ্রের মধ্যে ছিলই না। উদ্দেশ্যকে গোপন রাখিয়া কোন কাজ সে করিতেই জানিত না। সেই জন্যই বোধ করি, তাহার সেই হৃদয়ের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন সত্য, কোন অজ্ঞাত নিয়মের বশে সেই বিশ্বব্যাপী

অবিচ্ছিন্ন নিখিল সত্যের দেখা পাইয়া, অনায়াসে অতি সহজেই তাহাকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিত। তাহার শুদ্ধ সরল বুদ্ধি পাকা ওস্তাদের উমেদারী না করিয়াই ঠিক ব্যাপারটি টের পাইত। বাস্তবিক, অকপট সহজ-বুদ্ধিই ত সংসারে পরম এবং চরম বুদ্ধি। ইহার উপরে ত কেহই নাই। ভাল করিয়া দেখিলে, মিথ্যা বলিয়া ত কোন বস্তুরই অস্তিত্ব এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চোখে পড়ে না। মিথ্যা শুধু মানুষের বুঝিবার এবং বুঝাইবার ফলটা। সোনাকে পিতল বলিয়া বুঝানও মিথ্যা, বুঝাও মিথ্যা, তাহা জানি। কিন্তু তাহাতে সোনারই বা কি, আর পিতলেরই বা কি আসে যায়। তোমার যাহা ইচ্ছা বুঝ না, তাহারা যা তাই ত থাকে। সোনা মনে করিয়া তাহাকে সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিলেও তাহার সত্যকার মূল্য-বৃদ্ধি হয় না, আর পিতল বলিয়া টান মারিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেও তার দাম কমে না। সেদিনেও সে পিতল, আজও সে পিতলই। তোমার মিথ্যার জন্য তুমি ছাড়া আর কেহ দায়ীও হয় না, ভ্রূক্ষেপও করে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তটাই পরিপূর্ণ সত্য। মিথ্যার অস্তিত্ব যদি কোথাও থাকে, তবে সে মনুষ্যের মন ছাড়া আর কোথাও নয়। সুতরাং এই অসত্যকে ইন্দ্র যখন তাহার অন্তরের মধ্যে, জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, কোনদিন স্থান দেয় নাই, তখন তাহার বিশুদ্ধ-বুদ্ধি যে মঙ্গল এবং সত্যকেই পাইবে, তাহা ত বিচিত্র নয়!

কিন্তু তাহার পক্ষে বিচিত্র না হইলেও, কাহারও পক্ষেই যে বিচিত্র নয়, এমন কথা বলিতেছি না। ঠিক এই উপলক্ষে আমার নিজের জীবনেই তাহার যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা বলিবার লোভ এখানে সংবরণ করিতে পারিতেছি না। এই ঘটনার দশ-বারো বৎসর পরে হঠাৎ একদিন অপরাহ্ণকালে সংবাদ পাওয়া গেল যে, একটি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ও-পাড়ায় সকাল হইতে মরিয়া পড়িয়া আছেন। কোনমতেই তাঁহার সৎকারের লোক জুটে নাই। না জুটিবার হেতু এই যে, তিনি কাশী হইতে ফিরিবার পথে রোগগ্রস্ত হইয়া এই সহরেই রেলগাড়ী হইতে নামিয়া পড়েন এবং সামান্য পরিচয়সূত্রে যাহার বাটীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এবং দুই রাত্রি বাস করিয়া আজ সকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তিনি 'বিলেত-

ফেরত' এবং সে সময়ে 'একঘরে'। ইহাই বৃদ্ধার অপরাধ যে, তাঁহাকে নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় এই 'একঘরে'র বাটীতে মরিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, সৎকার করিয়া পরদিন সকালে ফিরিয়া আসিয়া দেখা গেল, প্রত্যেকেরই বাটীর কবাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শুনিতে পাওয়া গেল, গতরাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত হারিকেন-লণ্ঠন হাতে সমাজপতিরা বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, এই অত্যন্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপকর্ম্ম (দাহ) করার জন্য এই কুলাঙ্গারদিগকে কেশচ্ছেদ করিতে হইবে, 'ঘাট' মানিতে হইবে, এবং এমন একটা বস্তু সর্ব্বসমক্ষে ভোজন করিতে হইবে, যাহা সুপবিত্র হইলেও খাদ্য নয়। তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া প্রতি বাড়ীতেই বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহাতে তাঁহাদের কোনই হাত নাই; কারণ, জীবিত থাকিতে তাঁহারা অশাস্ত্রীয় কাজ সমাজের মধ্যে কিছুতেই ঘটিতে দিতে পারিবেন না। আমরা অনন্যোপায় হইয়া ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হইলাম। তিনিই তখন সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং বিনা দক্ষিণায় বাঙালীর বাটীতে চিকিৎসা করিতেন। আমাদের কাহিনী শুনিয়া ডাক্তারবাবু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রকাশ করিলেন, যাহারা এইরূপ নির্য্যাতন করিতেছে, তাহাদের বাটীর কেহ চোখের সম্মুখে বিনা-চিকিৎসায় মরিয়া গেলেও তিনি সেদিকে আর চাহিয়া দেখিবেন না। কে একথা তাঁহাদের গোচর করিল জানি না; দিবা অবসান না হইতেই শুনিলাম, কেশচ্ছেদের আবশ্যকতা নাই, শুধু 'ঘাট' মানিয়া সেই সুপবিত্র পদার্থটা ভক্ষণ করিলেই হইবে। আমরা স্বীকার না করায়, পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলাম, ঘাট মানিলেই হইবে—ওটা না হয় নাই খাইলাম। ইহাও অস্বীকার করায় শোনা গেল, আমাদের এই প্রথম অপরাধ বলিয়া তাঁহারা এমনিই মার্জ্জনা করিয়াছেন—প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ডাক্তারবাবু কহিলেন, প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা যে এই দু'টো দিন ইহাদিগকে ক্লেশ দিয়াছেন, সেইজন্য যদি প্রত্যেকে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া না যান, তাহা হইলে তাঁহার যে কথা সেই কাজ; অর্থাৎ তিনি কাহারও বাটীতে যাইবেন না। তারপর সেই সন্ধ্যাবেলাতেই ডাক্তারবাবুর বাটীতে একে একে বৃদ্ধ সমাজপতিদিগের

শুভাগমন হইয়াছিল। আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহারা কি কি বলিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য শুনিতে পাই নাই ; কিন্তু পরদিন ডাক্তারবাবুর আর ক্রোধ ছিল না, আমাদিগকে ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়ই নাই।

যাক্, কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। কিন্তু সে যাই হউক, আমি নিশ্চয় জানি—যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এই নামধামহীন বিবরণটির মধ্যে সমস্ত সত্যটিই উপলব্ধি করিবেন। আমার বলিবার মূল বিষয়টি এই যে, ইন্দ্র ঐ বয়সে নিজের অন্তরের মধ্যে যে সত্যটির সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, অত বড় বড় সমাজপতিরা অতটা প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাহার কোন তত্ত্বই পান নাই এবং ডাক্তারবাবু সেদিন অমন করিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের চিকিৎসা না করিয়া দিলে, কোনদিন এ-ব্যাধি তাঁহাদের আরোগ্য হইত কি না, তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

চড়ার উপর আসিয়া অর্দ্ধমগ্ন বন-ঝাউয়ের অন্ধকারের মধ্যে জলের উপর সেই অপরিচিত শিশুদেহটিকে ইন্দ্র যখন অপূর্ব্ব মমতার সহিত রাখিয়া দিল, তখন রাত্রি আর বড় বাকী নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া সে সেই শবের পানে মাথা ঝুঁকাইয়া থাকিয়া অবশেষে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহাব মুখের যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে—অত্যন্ত ম্লান এবং উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলে যেরূপ দেখায়, তাহার শুষ্কমুখে ঠিক সেই ভাব প্রকাশ পাইল।

আমি বলিলাম, ইন্দ্র এইবার চল।

ইন্দ্র অন্যমনস্কভাবে কহিল, কোথায় ?

এই যে বল্‌লে, কোথায় যাবে ?

থাক্—আজ আর না।

আমি খুসী হইয়া কহিলাম, বেশ, তাই ভাল ভাই—চল বাড়ী যাই।

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—হাঁরে শ্রীকান্ত, মর্‌লে মানুষ কি হয়, তুই জানিস্ ?

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, না ভাই জানিনে ; তুমি বাড়ী চল। তারা সব স্বর্গে যায় ভাই! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে বাড়ী রেখে এস।

ইন্দ্র যেন কর্ণপাতই করিল না, কহিল, সবাই ত স্বর্গে যেতে পায় না। তা ছাড়া, খানিকক্ষণ সবাইকেই এখানে থাকতে হয়। ছ্যাখ্ আমি যখন ওকে জলের উপর শুইয়ে দিচ্ছিলুন, সে চুপি চুপি স্পষ্ট বললে, 'ভেইয়া'।

আমি কম্পিতকণ্ঠে কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, কেন ভয় দেখাচ্ছ ভাই, আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো।

ইন্দ্র কথা কহিল না, অভয় দিল না, ধীরে ধীরে বোটে হাতে করিয়া নৌকা ঝাউবন হইতে বাহির করিয়া ফেলিল এবং সোজা বাহিতে লাগিল। মিনিট দুই নিঃশব্দে থাকিয়া গম্ভীর মৃদুস্বরে কহিল, শ্রীকান্ত, মনে মনে রামনাম কর্, সে নৌকা ছেড়ে যায়নি—আমার পেছনেই বসে আছে।

তার পরে সেইখানেই মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর আমার মনে নাই। যখন চোখ চাহিলাম, তখন অন্ধকার নাই—নৌকা কিনারায় লাগানো। ইন্দ্র আমার পায়ের কাছে বসিয়াছিল ; কহিল, এইটুকু হেঁটে যেতে হবে শ্রীকান্ত, উঠে বোস্।

চার

পা আর চলে না—এমনি করিয়া গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া সকালবেলা রক্তচক্ষু ও একান্ত শুষ্ক ম্লানমুখে বাটী ফিরিয়া আসিলাম। একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। এই যে! এই যে! করিয়া সবাই সমস্বরে এমনি অভ্যর্থনা করিয়া উঠিল যে, আমার হৃৎপিণ্ড থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

যতীনদা আমার প্রায় সমবয়সী। অতএব তাহার আনন্দটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড। সে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া, উন্মত্ত চীৎকার-শব্দে,—এসেছে শ্রীকান্ত—এই এল মেজদা। বলিয়া বাড়ী ফাটাইয়া আমার আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিল এবং মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া পরম সমাদরে আমার হাতটি ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বৈঠকখানায় পাপোষের উপর দাঁড় করাইয়া দিল।

সেখানে মেজদা গভীর মনোযোগের সহিত পাশের পড়া পড়িতেছিলেন। মুখ তুলিয়া একটিবার মাত্র আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনশ্চ পড়ায় মন দিলেন। অর্থাৎ বাঘ শিকার হস্তগত করিয়া নিরাপদে বসিয়া যেরূপ অবহেলার সহিত অন্যদিকে চাহিয়া থাকে, তাঁহারও সেই ভাব। শাস্তি দিবার এতবড় মাহেন্দ্রযোগ তাঁহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটিয়াছে কি না, সন্দেহ।

মিনিটখানেক চুপচাপ। সারারাত্রি বাহিরে কাটাইয়া গেলে কর্ণযুগল ও উভয় গণ্ডের উপর যে সকল ঘটনা ঘটিবে, তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু আর যে দাঁড়াতে পারি না! অথচ কর্ম্মকর্ত্তারও ফুরসৎ নাই। তাঁহারও যে আবার পাশের পড়া!

আমাদের এই মেজ-দাদাটিকে আপনারা বোধ করি এত শীঘ্র বিস্মৃত হ'ন নাই। সেই, যাঁহার কঠোর তত্ত্বাবধানে কাল সন্ধ্যাকালে আমরা পাঠাভ্যাস করিতেছিলাম এবং ক্ষণেক পরেই যাঁহার সুগম্ভীর 'ওঁা তোঁা-' রবেও সেজ-উল্টানোর চোটে গত রাত্রির সেই 'দি রয়েল বেঙ্গল'কেও দিশাহারা হইয়া একেবারে ডালিমতলায় ছুটিয়া পলাইতে হইয়াছিল, সেই তিনি।

পাঁজিটা একবার দেখ্ দেখি রে, সতীশ, এ বেলা আবার বেগুন খেতে আছে না কি—বলিতে-বলিতে পাশের দ্বার ঠেলিয়া পিসীমা ঘরে পা দিয়াই আমাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। কখন এলি রে? কোথায় গিয়েছিলি? ধন্যি ছেলে বাবা তুমি—সারা রাত্রিটা ঘুমোতে পারিনি—ভেবে মরি, সেই যে ইন্দ্রের সঙ্গে চুপি-চুপি বেরিয়ে গেল— আর দেখা নেই! না খাওয়া, না দাওয়া; কোথা ছিলি বল্ ত হতভাগা? মুখ কালিবর্ণ, চোখ রাঙা— ছল্ ছল্ করছে— বলি জ্বর-টর হয়নি ত? কই, কাছে আয় গা দেখি—একসঙ্গে, এতগুলো প্রশ্ন করিয়া পিসীমা নিজেই আগাইয়া আসিয়া আমার কপালে হাত দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, যা ভেবেচি তাই। এই যে, বেশ গা গরম হয়েছে—এমন সব ছেলের হাত-পা বেঁধে জল-বিছুটি দিলে তবে রাগ যায়। তোমাকে বাড়ী থেকে একেবারে বিদেয় ক'রে তবে আমার আর কাজ। চল্, ঘরে গিয়ে শুবি, আয় হতভাগা ছোঁড়া!—বলিয়া

তিনি বার্ত্তাকু-ভক্ষণের প্রশ্ন বিস্মৃত হইয়া, আমায় হাত ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইলেন।

মেজদা জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে সংক্ষেপে কহিলেন, এখন ও যেতে পারবে না।

কেন, কি করবে ও? না না, এখন আর পড়তে হবে না। আগে যা-হোক, দুটো মুখে দিয়ে একটু ঘুমোক্। আয় আমার সঙ্গে, বলিয়া পিসীমা আমাকে লইয়া চলিবার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু শিকার যে হাতছাড়া হয়! মেজদা স্থান-কাল ভুলিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া আমাকে ধমক্ দিয়া উঠিলেন—খবরদার! যাস্‌নে বলচি শ্রীকান্ত!

পিসীমা পর্য্যন্ত যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। তারপরে মুখ ফিরাইয়া মেজদার প্রতি চাহিয়া শুধু কহিলেন—স'তে! পিসীমা অত্যন্ত রাশভারি লোক। বাড়ীসুদ্ধ সবাই তাঁহাকে ভয় করিত। মেজদা সে চাহনির সম্মুখে ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া উঠিল, আবার পাশের ঘরেই বড়দা বসেন। কথাটা তাঁর কানে গেলে আর রক্ষা থাকিত না।

পিসীমার একটা স্বভাব আমরা চিরদিন লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, কখনও কোন কারণেই তিনি চেঁচামেচি করিয়া লোক জড় করিয়া তুলিতে ভালবাসিতেন না। হাজার রাগ হইলেও তিনি জোরে কথা বলিতেন না। তিনি কহিলেন, তাই বুঝি ও দাঁড়িয়ে এখানে? দেখ সতীশ, যখন-তখন শুনি, তুই ছেলেদের মারধোর করিস্। আজ থেকে কারো গায়ে যদি তুই হাত দিস্, আমি জানতে পারি, এই থামে বেঁধে চাকর দিয়ে তোকে আমি বেত দেওয়াব। বেহায়া, নিজে ফি বছর ফেল হচ্ছে—ও আবার যায় পরকে শাসন কর্‌তে। কেউ পড়ুক, না পড়ুক, কারুকে তুই জিজ্ঞেসা পর্য্যন্ত করতে পাবিনে।—বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া, যে পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে বাহির হইয়া গেলেন। মেজদা মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিল। এ আদেশ অবহেলা করিবার সাধ্য বাড়ীতে কাহারো নাই—সেকথা মেজদা ভাল করিয়াই জানিত।

আমাকে সঙ্গে করিয়া পিসীমা তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে আনিয়া

কাপড় ছাড়াইয়া দিলেন এবং পেট ভরিয়া গরম-গরম জিলাপি আহার করাইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া—আমি মরিলেই তাঁর হাড় জুড়ায়—এই কথা জানাইয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মিনিট পাঁচেক পরেই খুট্ করিয়া সাবধানে শিকল খুলিয়া ছোড়দা হাঁপাইতে-হাঁপাইতে আসিয়া আমার বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িল। আনন্দের আতিশয্যে প্রথমটা সে কথা কহিতেই পারিল না। একটুখানি 'দম' লইয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিল, মেজদাকে মা কি হুকুম দিয়েচে জানিস্? আমাদের কোন কথায় তার থাক্‌বার জো-টি নেই। তুই, আমি, য'তে এক ঘরে প'ড়ব—মেজদা অন্য ঘরে প'ড়বে। আমাদের পুরানো পড়া বড়দা দেখবেন। ওকে আমরা আর কেয়ার কর্‌ব না!—বলিয়া সে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একত্র করিয়া সবেগে আন্দোলিত করিয়া দিল।

যতীনদাও পিছনে-পিছনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। সে তাহার কৃতিত্বের উত্তেজনায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল এবং ছোড়দাকে এই শুভসংবাদ দিয়া সে-ই এখানে আনিয়াছিল। প্রথমে সে খুব খানিকটা হাসিয়া লইল। হাসি থামিলে নিজের বুকে বারংবার করাঘাত করিয়া কহিল, আমি! আমি! আমার জন্যেই হ'ল তা জানো? ওকে আমি মেজদার কাছে না নিয়ে গেলে কি মা হুকুম দিত! ছোড়দা, তোমার কলের লাট্টুটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে, তা বলে দিচ্চি।

আচ্ছা দিলুম। নি গে যা আমার ডেস্ক থেকে, বলিয়া ছোড়দা তৎক্ষণাৎ হুকুম দিয়া ফেলিল। কিন্তু এই লাট্টুটা বোধ করি সে ঘণ্টাখানেকে পূর্ব্বে পৃথিবীর বিনিময়েও দিতে পারিত না।

এম্‌নিই মানুষের স্বাধীনতার মূল্য। এম্‌নিই মানুষের ব্যক্তিগত ন্যায্য অধিকার লাভ করার আনন্দ! আজ আমার কেবলই মনে হইতেছে—শিশুদের কাছেও তাহার দুর্ম্মূল্যতা একবিন্দু কম নয়। মেজদা তাহার অগ্রজের অধিকারে স্বেচ্ছাচারে ছোটদের যে সমস্ত অধিকার গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, তাহাকেই ফিরিয়া পাইবার সৌভাগ্যে ছোড়দা তাহার প্রাণতুল্য প্রিয় বস্তুটিকেও অসঙ্কোচে হাতছাড়া করিয়া ফেলিল। বস্তুতঃ,

মেজদার অত্যাচারের আর সীমা ছিল না। রবিবারে দুপুর-রৌদ্রে এক মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া তাঁহার তাসখেলার বন্ধু ডাকিয়া আনিতে হইত; গ্রীষ্মের ছুটির দিনে তাঁহার দিবানিদ্রার সমস্ত সময়টা পাখার বাতাস করিতে হইত; শীতের রাত্রে তিনি লেপের মধ্যে হাত-পা ঢুকাইয়া কচ্ছপের মত বসিয়া বই পড়িতেন, আর আমাদিগকে কাছে বসিয়া তাঁহার বহির পাতা উল্টাইয়া দিতে হইত—এম্‌নি সমস্ত অত্যাচার! অথচ, 'না' বলিবার যো নাই, কাহারও কাছে অভিযোগ করিবার সাধ্য পর্য্যন্ত নাই। ঘূণাক্ষরে জানিতে পারিলেও তৎক্ষণাৎ হুকুম করিয়া বসিতেন, কেশব, তোমার জিয়োগ্রাফি আনো, পুরনো পড়া দেখি। যতীন, যাও—একটা ভাল দেখে ঝাউয়ের ছড়ি ভেঙে আনো। অর্থাৎ প্রহার অনিবার্য্য। অতএব আনন্দের মাত্রাও যে ইহাদের বাড়াবাড়িতে গিয়া পড়িবে, ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

কিন্তু সে যতই হউক, আপাততঃ তাহাকে স্থগিত রাখা আবশ্যক, কারণ, স্কুলের সময় হইতেছে। আমার জ্বর। সুতরাং কোথাও যাইতে হইবে না।

মনে পড়ে, সেই রাত্রেই জ্বরটা প্রবল হইয়াছিল এবং সাত আট দিন পর্য্যন্ত শয্যাগত ছিলাম।

তার কতদিন পরে স্কুলে গিয়াছিলাম এবং আরও যে কতদিন পরে ইন্দ্রের সহিত আবার দেখা হইয়াছিল, তাহা মনে নাই; কিন্তু সেটা যে অনেকদিন পরে, একথা মনে আছে। সেদিন শনিবার। স্কুল হইতে সকাল সকাল ফিরিয়াছি। গঙ্গায় তখন জল মরিতে সুরু করিয়াছে। তাহারই সংলগ্ন একটা নালার ধারে বসিয়া, ছিপ দিয়া ট্যাঙরা মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছি। অনেকেই ধরিতেছে। হঠাৎ চোখ পড়িল, কে একজন অদূরে একটা শর-ঝাড়ের আড়ালে বসিয়া টপাটপ্ মাছ ধরিতেছে। লোকটিকে ভাল দেখা যায় না, কিন্তু, তাহার মাছধরা দেখা যায়। অনেকক্ষণ হইতেই আমার এ জায়গাটা পছন্দ হইতেছিল না। মনে করিলাম, উহারই পাশে গিয়া বসি। ছিপ হাতে করিয়া একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইবামাত্র সে কহিল,

আমার ডান দিকে বোস্। ভাল আছিস্ ত রে শ্রীকান্ত? বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। তখনও তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই; কিন্তু বুঝিলাম, এ ইন্দ্র। দেহের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের তীব্র প্রবাহ বহিয়া গেলে, যে যেখানে আছে, একমুহূর্ত্তে যেমন সজাগ হইয়া উঠে, ইহার কণ্ঠস্বরেও আমার সেই দশা হইল। চক্ষের পলকে সর্ব্বাঙ্গের রক্ত চঞ্চল, উদ্দাম হইয়া বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। কোনমতেই মুখ দিয়া একটা জবাব বাহির হইল না। এই কথাগুলি লিখিলাম বটে, কিন্তু জিনিষটা ভাষায় ব্যক্ত করিয়া পরকে বুঝানো শুধুই যে অত্যন্ত কঠিন, তা' নয়, বোধ করি বা অসাধ্য! কারণ, বলিতে গেলে, এই সমস্ত বহু-ব্যবহৃত মামুলি বাক্যরাশি—যেমন বুকের রক্ত তোলপাড় করা—উদ্দাম চঞ্চল হইয়া আছাড় খাওয়া—তড়িৎপ্রবাহ বহিয়া যাওয়া—এই সব ছাড়া ত আর পথ নাই। কিন্তু কতটুকু ইহাতে বুঝাইল? যে জানে না, তাহার কাছে আমার মনের কথা কতটুকু প্রকাশ পাইল? আমিই বা কি করিয়া তাহাকে জানাইব এবং সেই বা কি করিয়া জানিবে? যে নিজের জীবনে একটি-দিনের তরেও অনুভব করে নাই, যাহাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়াছি, কামনা করিয়াছি, আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, অথচ পাছে কোথাও কোনরূপে দেখা হইয়া পড়ে, এই ভয়েও অহরহ কাঁটা হইয়া আছি, সে এমনি অকস্মাৎ, এতই অভাবনীয়রূপে আমার চোখের উপর থাকিয়া আমাকে পার্শ্বে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিল! পাশে গিয়াও বসিলাম, কিন্তু তখনও কথা কহিতে পারিলাম না।

ইন্দ্র কহিল, সেদিন ফিরে এসে বড় মার খেয়েছিলি—না রে, শ্রীকান্ত? আমি তোকে নিয়ে গিয়ে ভাল কাজ করিনি। আমার সেজন্যে রোজ বড় দুঃখ হয়।

আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, মার খাই নাই।

ইন্দ্র খুসী হইয়া বলিল, খাস্‌নি! দেখ্ রে শ্রীকান্ত, তুই চ'লে গেলে আমি মা কালীকে অনেক ডেকেছিলাম—যেন তোকে কেউ না মারে। কালীঠাকুর বড় জাগ্রত দেবতা রে! মন দিয়ে ডাক্‌লে কখনো কেউ মারতে পারে না। মা এসে তাদের এমনি ভুলিয়ে দেন যে, কেউ কিছু করতে

পারে না—বলিয়া সে ছিপটা রাখিয়া দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া, বোধ করি তাঁকেই মনে মনে প্রণাম করিল। বঁড়শীতে একটা টোপ দিয়া সেটা জলে ফেলিয়া বলিল, আমি ত ভাবিনি তোর জ্বর হবে, তা হ'লে সেও হ'তে দিতুম না।

আমি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিলাম, কি করতে তুমি?

ইন্দ্র কহিল, কিছুই না। শুধু জবাফুল তুলে এনে মা কালীর পায়ে দিতুম। উনি জবাফুল বড় ভালবাসেন! যে যা ব'লে দেয়, তার তাই হয়। এ ত সবাই জানে। তুই জানিস্‌নে?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার অসুখ করেনি?

ইন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, আমার কখ্‌খনো অসুখ করে না, কখ্‌খনো কিচ্ছু হয় না। হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, দেখ্‌ শ্রীকান্ত, আমি তোকে একটা জিনিষ শিখিয়ে দেবো। যদি তুই দু'বেলা খুব মন দিয়ে ঠাকুর-দেবতার নাম করিস্‌—তাঁরা সব সামনে এসে দাঁড়াবেন, তুই স্পষ্ট দেখতে পাবি, তখন আর তোর কোন অসুখ করবে না। কেউ তোর একগাছি চুল পর্য্যন্তও ছুঁতে পার্‌বে না—তুই আপনি টের পাবি—আমার মতন যেখানে খুসী যা, যা খুসী কর্‌, কোন ভাবনা নেই। বুঝলি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হুঁ। বঁড়শীতে টোপ দিয়া জলে ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তুমি কাকে নিয়ে সেখানে যাও?

কোথায়?

ওপারে মাছ ধর্‌তে।

ইন্দ্র ছিপটা তুলিয়া লইয়া সাবধানে পাশে রাখিয়া বলিল, আমি আর যাইনে।

তাহার কথা শুনিয়া ভারী আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, আর একদিনও যাওনি?

না, একদিনও না। আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে—কথাটা ইন্দ্র শেষ না করিয়াই ঠিক যেন থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল।

উহার সম্বন্ধে এই কথাই আমাকে অহরহ খোঁচার মত বিঁধিয়াছে। কোনমতেই সেদিনের সেই মাছ-বিক্রীটা ভুলিতে পারি নাই। তাই সে যদি

বা চুপ করিয়া গেল, আমি পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে মাথার দিব্যি দিলে ভাই? তোমার মা?

না, মা নয়। বলিয়া ইন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তার পরে সে ছিপের গায়ে সূতাটা ধীরে-ধীরে জড়াইতে জড়াইতে কহিল, শ্রীকান্ত, আমাদের সে রাত্রির কথা তুই বাড়ীতে ব'লে দিস্‌নি?

আমি বলিলাম, না। কিন্তু তোমার সঙ্গে চলে গিয়েছিলুম, তা সবাই জানে।

ইন্দ্র আর কোন প্রশ্ন করিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম, এইবার সে উঠিবে। কিন্তু তাহাও করিল না—চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখে সর্ব্বদাই কেমন একটা হাসির ভাব থাকে, এখন তাহাও নাই, এবং কি একটা সে যেন আমাকে বলিতে চায়, অথচ তাহাও পারিতেছে না বলিয়া উঠিতেও পারিতেছে না—বসিয়া থাকিতেও যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছে। আপনারা পাঁচজন এখানে হয়ত বলিয়া বসিবেন, এটি বাপু তোমার কিন্তু মিছে কথা। অতখানি মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার বয়সটা ত তা' নয়। আমিও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু, আপনারাও এ কথাটা ভুলিতেছেন যে, আমি ইন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিলাম। একজন আর একজনের মন বুঝে সহানুভূতি এবং ভালবাসা দিয়া—বয়স এবং বুদ্ধি দিয়া নয়। সংসারে যে যত ভাল-বাসিয়াছে, পরের হৃদয়ের ভাষা তাহার কাছে তত ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই অত্যন্ত কঠিন অন্তর্দৃষ্টি শুধু ভালবাসার জোরেই পাওয়া যায়, আর কিছুতে নয়। তাহার প্রমাণ দিতেছি। ইন্দ্র মুখ তুলিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলিতে না পারিয়া সমস্ত মুখ তার অকারণে রাঙা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একটা শরের ডাঁটা ছিঁড়িয়া নতমুখে জলের উপর নাড়িতে নাড়িতে কহিল, শ্রীকান্ত!

কি ভাই?

তোর—তোর কাছে—টাকা আছে?

ক'টাকা?

ক'টাকা? এই—ধর, পাঁচ টাকা—

আছে। তুমি নেবে? বলিয়া আমি ভারি খুসী হইয়া তাহার মুখপানে

চাহিলাম। এ কয়টি টাকাই আমার ছিল। ইন্দ্রের কাজে লাগিবার অপেক্ষা তাহার সদ্ব্যবহার আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না। কিন্তু ইন্দ্র ত কৈ খুসী হইল না। মুখ যেন তাহার অধিকতর লজ্জায় কি একরকম হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু, আমি ত এখন তোকে ফিরিয়ে দিতে পারব না।

আমি আর চাইনে, বলিয়া সগর্ব্বে তাহার মুখের পানে চাহিলাম।

আবার কিছুক্ষণ সে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া থাকিয়া ধীরে-ধীরে কহিল, আমি নিজে চাইনে। একজনদের দিতে হবে, তাই। তারা বড় দুঃখী রে —খেতেও পায় না! তুই যাবি সেখানে?

চক্ষের নিমেষে আমার সেই রাত্রির কথা মনে পড়িল। কহিলাম, সেই যাদের তুমি টাকা দিতে নেমে যেতে চেয়েছিল?

ইন্দ্র অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ, তারাই। টাকা আমি নিজেই ত কত দিতে পারি, কিন্তু দিদি যে কিছুতে নিতে চায় না। তোকে একটিবার যেতে হবে শ্রীকান্ত, নইলে এ টাকাও নেবে না; মনে করবে আমি মায়ের বাক্স থেকে চুরি ক'রে এনেচি! যাবি শ্রীকান্ত?

তারা বুঝি তোমার দিদি হয়?

ইন্দ্র একটু হাসিয়া কহিল, না দিদি হয় না—দিদি বলি। যাবি ত?

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তখনি কহিল,—দিনের বেলা গেলে সেখানে কোন ভয় নেই। কাল রবিবার; তুই খেয়ে-দেয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকিস্, আমি নিয়ে যাবো; আবার তখুনি ফিরিয়ে আন্‌ব। যাবি ত ভাই? বলিয়া যেমন করিয়া সে আমার হাতটি ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহাতে আমার 'না' বলিবার সাধ্য রহিল না। আমি দ্বিতীয়বার তাহার নৌকায় উঠিবার কথা দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

কথা দিলাম সত্য, কিন্তু, সে যে কতবড় দুঃসাহসের কথা, সে ত আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না। সমস্ত বিকালবেলাটা মন ভারী হইয়া রহিল, এবং রাত্রে ঘুমের ঘোরে প্রগাঢ় অশান্তির ভাব সর্ব্বাঙ্গে বিচরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ভোরবেলা উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে ইহাই মনে পড়িল, আজ যেখানে যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সেখানে যাইলে কোনমতেই

আমার ভাল হইবে না। কোন সূত্রে কেহ জানিতে পারিলে, ফিরিয়া আসিয়া যে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, মেজদার জন্যও ছোড়দা বোধ করি সে শাস্তি কামনা করিতে পারিত না। অবশেষে খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে টাকা পাঁচটি লুকাইয়া লইয়া নিঃশব্দে যখন বাহির হইয়া পড়িলাম, তখন এমন কথাও অনেকবার মনে হইল—কাজ নাই গিয়া। নাই বা কথা রাখিলাম ; এমনই বা তাহাতে কি আসে যায়। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শর-ঝাড়ের নীচে সেই ছোট্ট নৌকাটির উপর ইন্দ্র উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। চোখোচোখি হইবামাত্র সে এমন করিয়া হাসিয়া আহ্বান করিল যে, না-যাওয়ার কথা মুখে আনিতেও পারিলাম না। সাবধানে ধীরে-ধীরে নামিয়া নিঃশব্দে চড়িয়া বসিলাম। ইন্দ্র নৌকা ছাড়িয়া দিল।

আজ মনে ভাবি, আমার বহু জন্মের সুকৃতির ফল যে, সেদিন ভয়ে পিছাইয়া আসি নাই। সেই দিনটিকে উপলক্ষ করিয়া যে জিনিষটি দেখিয়া লইয়াছিলাম, সারাজীবনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াও তেমন কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ? আমিই বা তাহার মত আর কোথায় দেখিতে পাইলাম ? জীবনে এমন সব শুভ মুহূর্ত্ত অনেকবার আসে না। একবার যদি আসে, সে সমস্ত চেতনার উপর এমন গভীর একটা ছাপ মারিয়া দিয়া যায় যে, সেই ছাঁচেই সমস্ত পরবর্ত্তী জীবন গড়িয়া উঠিতে থাকে। আমার তাই বোধ হয়, স্ত্রীলোককে কখনও আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না। বুদ্ধি দিয়া যতই কেননা তর্ক করি, সংসারে পিশাচী কি নাই ? নাই যদি, তবে পথে-ঘাটে এত পাপের মূর্ত্তি দেখি কাহাদের ? সবাই যদি সেই ইন্দ্রের দিদি, তবে এত প্রকার দুঃখের স্রোত বহাইতেছে কাহারা ? তবুও কেমন করিয়া যেন মনে হয়, এ সকল তাহাদের শুধু বাহ্য আবরণ ; যখন খুসী ফেলিয়া দিয়া ঠিক তাঁর মতই তাঁর আসনের উপর অনায়াসে গিয়া বসিতে পারে। বন্ধুরা বলেন, ইহা আমার একটা অতি জঘন্য শোচনীয় ভ্রম মাত্র। আমি তাহারও প্রতিবাদ করি না। শুধু বলি, ইহা আমার যুক্তি নয়—আমার সংস্কার। সংস্কারের মূলে যিনি, জানি না সেই পুণ্যবতী আজও বাঁচিয়া আছেন কিনা।

থাকিলেও কোথায় কি ভাবে আছেন, তাঁহার নির্দ্দেশমত কখনো কোন সংবাদ লইবার চেষ্টাও করি নাই। কিন্তু কত যে মনে-মনে তাঁকে প্রণাম করিয়াছি, তাহা যিনি সব জানিতে পারেন, তিনিই জানেন।

শ্মশানের সেই সঙ্কীর্ণ ঘাটের পাশে বটবৃক্ষমূলে ডিঙ্গি বাঁধিয়া যখন দু'জনে রওনা হইলাম, তখনও অনেক বেলা ছিল। কিছুদূর গিয়া ডানদিকে বনের ভিতর ঠাহর করিয়া দেখায়, একটা পথের মতও দেখা গেল। ইন্দ্র তাহাই ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রায় দশ মিনিট চলিবার পর একটা পর্ণকুটীর দেখা গেল। কাছে আসিয়া দেখিলাম, ভিতরে ঢুকিবার পথ আগড় দিয়া আবদ্ধ। ইন্দ্র সাবধানে তাহার বাঁধন খুলিয়া ঠেলা দিয়া প্রবেশ করিল এবং আমাকে টানিয়া লইয়া পুনরায় তেমন করিয়া বাঁধিয়া দিল। আমি তেমন বাসস্থান কখনো জীবনে দেখি নাই। একে ত চতুর্দিকেই নিবিড় জঙ্গল, তাহাতে মাথার উপরে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ এবং পাকুড় গাছে সমস্ত জায়গাটা যেন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সাড়া পাইয়া একপাল মুরগী এবং ছানাগুলা চীৎকার করিয়া উঠিল। একধারে বাঁধা গোটা-দুই ছাগল ম্যা-ম্যা করিয়া ডাকিয়া উঠিল। সুমুখে চাহিয়া দেখি—ওরে বাবা! একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রায় সমস্ত উঠান জুড়িয়া আছে। চক্ষের নিমেষে অস্ফুট চীৎকারে মুরগীগুলাকে আরও ত্রস্ত-ভীত করিয়া দিয়া আঁচড়-পিঁচড় করিয়া একেবারে সেই বেড়ার উপর চড়িয়া বসিলাম। ইন্দ্র খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, ও কিছু বলে না রে, বড় ভালমানুষ। ওর নাম রহিম। বলিয়া, কাছে গিয়া তাহার পেটটা ধরিয়া টানিয়া উঠানের ও-ধারে সরাইয়া দিল। তখন নামিয়া আসিয়া ডানদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই পর্ণকুটীরের বারান্দার উপরে বিস্তর ছেঁড়া চাটাই ও ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় বসিয়া একটা দীর্ঘকায় পাতলাগোছের লোক প্রবল কাশির পরে হাঁপাইতেছে। তাহার মাথায় জটা উচু করিয়া বাঁধা, গলায় বিবিধ প্রকারের ছোটবড় মালা। গায়ের জামা এবং পরণের কাপড় অত্যন্ত মলিন এবং একপ্রকার হলুদে রঙে ছোপানো। তাহার লম্বা দাড়ি বস্ত্রখণ্ড দিয়া জটার সহিত বাঁধা ছিল

বলিয়াই প্রথমটা চিনিতে পারি নাই ; কিন্তু কাছে আসিয়াই চিনিলাম, সে সাপুড়ে। মাস পাঁচ-ছয় পূর্ব্বে তাহাকে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতাম। আমাদের বাটীতে তাহাকে কয়েকবার সাপ খেলাইতে দেখিয়াছি। ইন্দ্র তাহাকে শাহজী সম্বোধন করিল এবং সে আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, হাত তুলিয়া ইন্দ্রকে গাঁজার সাজ-সরঞ্জাম এবং কলিকাটি দেখাইয়া দিল। ইন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া আদেশ পালন করিতে লাগিয়া গেল, এবং প্রস্তুত হইলে শাহজী সেই কাশির উপর ঠিক যেন 'মরি-বাঁচি' পণ করিয়া টানিতে লাগিল এবং একবিন্দু ধোঁয়াও পাছে বাহির হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় নাকেমুখে বাম-করতল চাপা দিয়া মাথায় একটা ঝাঁকানির সহিত কলিকাটি ইন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, পিয়ো—

ইন্দ্র পান করিল না। ধীরে-ধীরে নামাইয়া রাখিয়া কহিল, না। শাহজী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞসা করিল ; কিন্তু উত্তরের জন্য একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়াই সেটা নিজেই তুলিয়া লইয়া টানিয়া-টানিয়া নিঃশেষ করিয়া উপুড় করিয়া রাখিল। তার পরে দু'জনের মৃদু-কণ্ঠে কথাবার্ত্তা সুরু হইল। তাহার অধিকাংশ শুনিতেও পাইলাম না, বুঝিতেও পারিলাম না। কিন্তু এই একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, শাহজী হিন্দীতে কথা কহিলেও ইন্দ্র বাঙলা ছাড়া কিছুই ব্যবহার করিল না।

শাহজীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল এবং দেখিতে-দেখিতে তাহা উন্মত্ত চীৎকারে পরিণত হইল। কাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে যে এরূপ অকথ্য অশ্রাব্য গালি-গালাজ উচ্চারণ করিতে লাগিল, তাহা তখন বুঝিলে, ইন্দ্র সহ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি করিতাম না। তার পরে লোকটা বেড়ায় ঠেস দিয়া বসিল এবং অনতিকাল পরেই ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ-চাপ বসিয়া থাকিয়া যেন অস্থির হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, বেলা যায় ; তুমি সেখানে যাবে না ?

কোথায়, শ্রীকান্ত ?

তোমার দিদিকে টাকা দিতে যাবে না ?

দিদির জন্যেই ত ব'সে আছি। এই ত তাঁর বাড়ী।

এই তোমার দিদির বাড়ী ? এরা ত সাপড়ে—মসলমান।

ইন্দ্র কি-একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াই, চাপিয়া গিয়া চুপ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষের দৃষ্টি বড় ব্যথায় একেবারে যেন ম্লান হইয়া গেল। একটু পরেই কহিল, একদিন তোকে সব কথা বলব। সাপ খেলাব দেখবি, শ্রীকান্ত ?

তাহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম—তুমি সাপ খেলাবে কি ? কামড়ায় যদি ?

ইন্দ্র উঠিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিয়া একটা ছোট ঝাঁপি এবং সাপুড়ের বাঁশী বাহির করিয়া আনিল এবং সুমুখে রাখিয়া ডালার বাঁধন আল্‌গা করিয়া বাঁশীতে ফুঁ দিল। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম, ডালা খুলো না ভাই, ভেতরে যদি গোখরো সাপ থাকে! ইন্দ্র তাহার জবাব দেওয়াও আবশ্যক মনে করিল না; শুধু ইঙ্গিতে জানাইল যে, সে গোখরো সাপই খেলাইবে; এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া-নাড়িয়া বাঁশী বাজাইয়া ডালাটা তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে-সঙ্গেই প্রকাণ্ড গোখরো একহাত উঁচু হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া ইন্দ্রের হাতের ডালায় একটা তীব্র ছোবল মারিয়া ঝাঁপি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাপ্ রে! বলিয়া ইন্দ্র উঠানে লাফাইয়া পড়িল। আমি বেড়ার গায়ে চড়িয়া বসিলাম। ক্রুদ্ধ সর্পরাজ বাঁশীর লাউয়ের উপর আর একটা কামড় দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল। ইন্দ্র মুখ কালী করিয়া কহিল,—এটা একেবারে বুনো। আমি যাকে খেলাই, সে নয়।

ভয়ে, বিরক্তিতে, রাগে আমার প্রায় কান্না আসিতেছিল; বলিলাম, কেন এমন কাজ করলে ? ও বেরিয়ে যদি শাহ্‌জীকে কামড়ায় ?

ইন্দ্রের লজ্জার পরিসীমা ছিল না। কহিল, ঘরের আগড়টা টেনে দিয়ে আসব ? কিন্তু যদি পাশেই লুকিয়ে থাকে ?

আমি বলিলাম, তা হ'লে বেরিয়েই ওকে কামড়াবে।

ইন্দ্র নিরুপায়ভাবে এদিকে-ওদিকে চাহিয়া বলিল, কামড়াক্ ব্যাটাকে। বুনো সাপ ধ'রে রাখে—গাঁজাখোর শালার এতটুকু বুদ্ধি নেই। এই যে দিদি! এসো না, এসো না; ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকো—

আমি ঘাড় ফিরিয়া ইন্দ্রের দিদিকে দেখিলাম—যেন ভস্মাচ্ছাদিত

বহ্নি। যেন যুগ-যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। বাঁ-কাঁকালে আঁটি-বাঁধা কতকগুলি শুক্‌নো কাঠ এবং ডানহাতে ফুলের সাজির মত একখানা ডালার মধ্যে কতকগুলি শাক-শব্জী। পরণে হিন্দুস্থানী মুসলমানীর মত জামা-কাপড় —গেরুয়া রঙে ছোপানো, কিন্তু ময়লায় মলিন নয়। হাতে দু'গাছি গালার চুড়ি। সিঁথায় হিন্দুস্থানীর মত সিঁদুরের আয়তিচিহ্ন। তিনি কাঠের বোঝাটা নামাইয়া রাখিয়া আগড়টা খুলিতে-খুলিতে বলিলেন, কি ?

ইন্দ্র মহাব্যস্ত হইয়া বলিল, খুলো না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—মস্ত একটা সাপ ঘরে ঢুকেচে।

তিনি আমার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন ভাবিয়া লইলেন। তার পরে একটুখানি হাসিয়া পরিষ্কার বাঙলায় বলিলেন, তাই ত! সাপুড়ের ঘরে সাপ ঢুকেচে, এ ত বড় আশ্চর্য! কি বল শ্রীকান্ত ? আমি অনিমেষ-দৃষ্টিতে শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

কিন্তু কি ক'রে সাপ ঢুকল ইন্দ্রনাথ ?

ইন্দ্র বলিল, ঝাঁপির ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েচে। একেবারে বুনো সাপ!

উনি ঘুমোচ্ছেন বুঝি ?

ইন্দ্র রাগিয়া কহিল, গাঁজা খেয়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে ঘুমোচ্চে। চেঁচিয়ে ম'রে গেলেও উঠবে না।

তিনি আবার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর সেই সুযোগে তুমি শ্রীকান্তকে সাপ-খেলানো দেখাতে গিয়েছিলে, না ? আচ্ছা, এসো, আমি ধ'রে দিচ্চি।

তুমি যেয়ো না দিদি, তোমাকে খেয়ে ফেলবে। শাহ্‌জীকে তুলে দাও —আমি তোমাকে যেতে দেব না। বলিয়া, ইন্দ্র ভয়ে দুই হাত প্রসারিত করিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

তাহার এই ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে যে ভালবাসা প্রকাশ পাইল, তাহা তিনি টের পাইলেন। মুহূর্তের জন্য চোখ দুটি তাঁহার ছলছল্‌ করিয়া উঠিল।

কিন্তু গোপন করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ওরে পাগলা, অত পুণ্যি তোর এই দিদির নেই। আমাকে খাবে না রে—এখ্‌খুনি ধ'রে দিচ্চি ছাখ—! বলিয়া বাঁশের মাচা হইতে একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং একমিনিটের মধ্যে সাপটাকে ধরিয়া আনিয়া ঝাঁপিতে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন।

ইন্দ্র ঢিপ্‌ করিয়া তাঁহার পায়ের উপর একটা নমস্কার করিয়া, পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, দিদি, তুমি যদি আমার আপনার দিদি হ'তে!

তিনি ডান হাত বাড়াইয়া ইন্দ্রের চিবুক স্পর্শ করিলেন এবং অঙ্গুলির প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া মুখ ফিরাইয়া বোধ করি অলক্ষ্যে একবার নিজের চোখ-দুটি মুছিয়া ফেলিলেন।

পাঁচ

সমস্ত ব্যাপারটা শুনিতে শুনিতে ইন্দ্রের দিদি হঠাৎ বার-দুই এমনি শিহরিয়া উঠিলেন যে, ইন্দ্রের সেদিকে যদি কিছুমাত্র খেয়াল থাকিত, সে আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। সে দেখিতে পাইল না, কিন্তু আমি পাইলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া সস্নেহে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিলেন, ছি দাদা, এমনকাজ আর কখ্‌খনো কো'রো না। এসব ভয়ানক জানোয়ার নিয়ে কি খেলা করতে আছে ভাই? ভাগ্যে তোমার হাতের ডালাটায় ছোবল মেরেছিল, না হ'লে আজ কি কাণ্ড হ'ত বল ত?

আমি কি তেম্‌নি বোকা, দিদি! বলিয়া ইন্দ্র সপ্রতিভ হাসিমুখে ফস্‌ করিয়া তাহার কোঁচার কাপড়টা টানিয়া ফেলিয়া কোমরে সূতা-বাঁধা কি একটা শুক্‌না শিকড় দেখাইয়া বলিল, এই ছাখো দিদি, আটঘাট বেঁধে রেখেচি কি না! এ না থাকলে কি আর আজ আমাকে না ছুবলে ছেড়ে দিত? শাহ্‌জীর কাছে এটুকু আদায় করতে কি আমাকে কম কষ্ট পেতে হয়েছে। এ সঙ্গে থাকলে কেউ ত কামড়াতে পারেই না, আর তাই যদি বা কামড়াত—তাতেই বা কি! শাহ্‌জীকে টেনে তুলে দুখ্‌খুনি

বিষ-পাথরটা ধরিয়ে দিতুম। আচ্ছা, দিদি, ঐ বিষ-পাথরটায় কতক্ষণে বিষ টেনে নিতে পারে? আধ ঘণ্টা? এক ঘণ্টা? না, অতক্ষণ লাগে না, না দিদি?

দিদি কিন্তু তেমনি নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ইন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, আজ দাও না দিদি আমাকে একটি। তোমাদের ত দুটো তিনটে রয়েচে—আর আমি কতদিন ধ'রে চাইচি। বলিয়া সে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, আমাকে তোমরা যা' বল, আমি তাই করি—আর তোমরা কেবল পট্টি দিয়ে আমাকে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু—যদি নাই দেবে, তবে ব'লে দাও না কেন? আমি আর অসব না—যাও।

ইন্দ্র লক্ষ্য করিল না, কিন্তু আমি তাহার দিদির মুখের পানে চাহিয়া বেশ অনুভব করিলাম যে, তাঁর মুখখানি কিসের অপরিসীম ব্যথায় ও লজ্জায় যেন একেবারে কালীবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই জোর করিয়া একটুখানি হাসির ভাব সেই শীর্ণ শুষ্ক ওষ্ঠাধরে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, হাঁ রে ইন্দ্র, তুই কি তোর দিদির বাড়ীতে শুধু সাপের মন্তর আর বিষ-পাথরের জন্যেই আসিস্ রে?

ইন্দ্র অসঙ্কোচে বলিয়া বসিল, তা না ত কি! নিদ্রিত শাহ্‌জীকে একবার আড়-চোখে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, কিন্তু ও কেবলই আমাকে ভোগা দিচ্চে—এ তিথি নয়, ও তিথি নয়, সে তিথি নয়, সেই যে কবে শুধু হাতচালার মন্তরটুকু দিয়েছিল, আর দিতেই চায় না! কিন্তু আজ আমি টের পেয়েছি দিদি, তুমিও কম নয়,—তুমিও সব জানো। ওকে আর আমি খোসামোদ করচিনে দিদি, তোমার কাছ থেকেই সমস্ত মন্তর আদায় ক'রে নেব। বলিয়াই আমার প্রতি চাহিয়া, সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া, শাহ্‌জীকে উদ্দেশ করিয়া গভীর সম্ভ্রমের সহিত কহিল, শাহ্‌জী গাঁজা-টাজা খান বটে, শ্রীকান্ত, কিন্তু তিন দিনের বাসি মড়া আধঘণ্টার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন—এতবড় ওস্তাদ উনি! হাঁ, দিদি, তুমিও মড়া বাঁচাতে পারো?

দিদি কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া সহসা খিল্‌খিল্ করিয়া

হাসিয়া উঠিলেন। সে কি মধুর হাসি! অমন করিয়া হাসিতে আমি আজ পর্য্যন্ত কম লোককেই দেখিয়াছি। কিন্তু, সে যেন নিবিড় মেঘভরা আকাশের বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত পরক্ষণেই অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

কিন্তু ইন্দ্র সেদিক্ দিয়াই গেল না, বরঞ্চ একেবারে পাইয়া বসিল। সেও হাসিয়া কহিল, আমি জানি, তুমি সব জানো। কিন্তু আমাকে একটি একটি ক'রে তোমাকে সব বিদ্যে দিতে হ'বে, তা ব'লে দিচ্চি! আমি যতদিন বাঁচব, তোমাদের একেবারে গোলাম হয়ে থাক্‌ব। তুমি ক'টা মড়া বাঁচিয়েচ, দিদি?

দিদি বলিলেন, আমি ত মড়া বাঁচাতে জানিনে, ইন্দ্রনাথ?

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, তোমাকে এ মন্তর শাহ্‌জী দেয়নি?

দিদি ঘাড় নাড়িয়া 'না' বলিলে, ইন্দ্র মিনিটখানেক তাঁর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া নিজেই তখন মাথা নাড়িতে-নাড়িতে বলিল, এ বিদ্যে কি কেউ শীগ্‌গির দিতে চায় দিদি! আচ্ছা, কড়ি-চালাটা নিশ্চয়ই শিখে নিয়েচ, না?

দিদি বলিলেন, কা'কে কড়ি-চালা বলে, তাই ত জানিনে ভাই?

ইন্দ্র বিশ্বাস করিল না। বলিল, ইস্! জান না বৈ কি! দেবে না, তাই বল। আমার দিকে চাহিয়া কহিল, কড়ি-চালা কখনো দেখেচিস্ শ্রীকান্ত? দুটি কড়ি মন্তর প'ড়ে ছেড়ে দিলে, তারা উড়ে গিয়ে যেখানে সাপ আছে, তার কপালে গিয়ে কামড়ে ধ'রে, সাপটাকে দশ দিনের পথ থেকে টেনে এনে হাজির ক'রে দেয়। এম্‌নি মন্তরের জোর! আচ্ছা দিদি, ঘর-বন্ধন, দেহ-বন্ধন, ধূলো-পড়া এ সব জান ত? আর যদি না-ই জানবে, ত অমন সাপটাকে ধ'রে দিলে কি ক'রে?—বলিয়া সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দিদির মুখপানে চাহিয়া রহিল।

দিদি অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া মনে-মনে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন, শেষে মুখ তুলিয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন, ইন্দ্র, তোর দিদির এসব কাণাকড়ির বিদ্যেও নেই। কিন্তু, কেন নেই, সে যদি তোর বিশ্বাস করিস্ ভাই, তা' হ'লে আজ তোদের কাছে আমি সমস্ত ভেঙ্গে ব'লে

আমার বুকখানা হাল্কা ক'রে ফেলি। বল্, তোরা আমার সব কথা আজ বিশ্বাস করবি? বলিতে বলিতেই তাঁহার শেষের কথাগুলি কেমন একরকম যেন ভারী হইয়া উঠিল।

আমি নিজে এতক্ষণ প্রায় কোন কথাই কহি নাই। এইবার সর্ব্বাগ্রে জোর করিয়া বলিয়া উঠিলাম,—আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করব দিদি! সব—যা' বলবে, সমস্ত। একটি কথাও অবিশ্বাস করব না।

তিনি আমার প্রতি চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করবে বই কি ভাই! তোমরা যে ভদ্রলোকের ছেলে! যারা ইতর, তারাই শুধু অজানা অচেনা লোকের কথায় সন্দেহে ভয়ে পিছিয়ে দাঁড়ায়! তা ছাড়া, আমি ত কখনও মিথ্যে কথা কইনে ভাই। বলিয়া তিনি আর একবার আমার প্রতি চাহিয়া ম্লানভাবে একটুখানি হাসিলেন।

তখন সন্ধ্যার ঝাপ্সা কাটিয়া গিয়া আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল এবং তাহারই অস্ফুট কিরণ-রেখা গাছের ঘন-বিন্যস্ত ডাল ও পাতার ফাঁক দিয়া নীচের গাঢ় অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া, দিদি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ইন্দ্রনাথ, মনে করেছিলুম, আজই আমার সমস্ত কথা তোমাদের জানিয়ে দেব। কিন্তু ভেবে দেখচি, এখনও সে সময় আসেনি। অমার এই কথাটুকু আজ শুধু বিশ্বাস কো'রো ভাই, আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি। আর তুমি মিথ্যে আশা নিয়ে শাহ্জীর পিছনে-পিছনে ঘুরে বেড়িয়ো না—আমরা মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানিনে, মড়াও বাঁচাতে পারিনে; কড়ি চেলে সাপ ধ'রে আনতেও পারিনে! আর কেউ পারে কি না জানিনে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই।

কি জানি কেন, আমি এই অত্যল্পকালের পরিচয়েই তাঁহার প্রত্যেক কথাটি অসংশয়ে বিশ্বাস করিলাম; কিন্তু, এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও ইন্দ্র পারিল না। সে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, যদি পার না, তবে সাপ ধরলে কি ক'রে?'

দিদি বলিলেন, এটা শুধু হাতের কৌশল, ইন্দ্র,—কোন মন্ত্রের জোরে নয়! সাপের মন্ত্র আমরা জানিনে।

ইন্দ্র বলিল, যদি জান না, তবে তোমরা দু'জনে জুচ্চুরি ক'রে, ঠকিয়ে আমার কাছ থেকে এত টাকা নিয়েচ কেন?

দিদি তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিল না; বোধ করি বা নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া লইতে লাগিলেন। ইন্দ্র পুনরায় কর্কশকণ্ঠে কহিল, ঠগ্ জোচ্চোর সব—আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি তোমাদের মজা।

অদূরেই একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছিল। আমি তাহারই আলোকে দেখিতে পাইলাম, দিদির মুখখানি একেবারে যেন মড়ার মত শাদা হইয়া গেল। সভয়ে, সসঙ্কোচে বলিলেন, আমরা যে সাপুড়ে ভাই, ঠকানোই যে আমাদের ব্যবসা—

ব্যবসা বার ক'রে দিচ্ছি—চল্ রে শ্রীকান্ত, জোচ্চোর শালাদের ছায়া মাড়াতে নেই। হারামজাদা বজ্জাত ব্যাটারা! বলিয়া ইন্দ্র সহসা আমার হাত ধরিয়া সজোরে একটা টান দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ইন্দ্রকে দোষ দিতে পারি না; কারণ, তাহার অনেকদিনের অনেক বড় আশা একেবারে চোখের পলকে ভূমিসাৎ হইয়া গেল, কিন্তু আমার দুই চোখ যে দিদির সেই দুটি চোখের পানে চাহিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারিল না। জোর করিয়া ইন্দ্রের হাত ছাড়াইয়া লইয়া, পাঁচটি টাকা রাখিয়া দিয়া বলিলাম, তোমার জন্যে এনেছিলাম দিদি—এই নাও।

ইন্দ্র ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া কহিল, আবার টাকা! জুচ্চুরি ক'রে এরা আমার কাছে কত টাকা নিয়েচে, তা তুই জানিস্ শ্রীকান্ত? এরা না খেয়ে শুকিয়ে মরুক, সেই আমি চাই।

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, না, ইন্দ্র, দাও—আমি দিদির নাম ক'রে এনেচি—

ওঃ—ভারি দিদি!—বলিয়া সে আমাকে টানিয়া বেড়ার কাছে আনিয়া ফেলিল।

এতক্ষণে গোলমালে শাহ্জীর নেশার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে, কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া?—বলিয়া উঠিয়া বসিল।

ইন্দ্র আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, ডাকু শালা! রাস্তায় তোমায় দেখতে পেলে চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেব। কেয়া হুয়া! বদমাস্ ব্যাটা কিচ্ছু জানে না—আর ব'লে বেড়ায় মন্তরের জোরে মড়া বাঁচাই! কখনো পথে দেখা হ'লে এবার ভাল ক'রে বাঁচাব তোমাকে!—বলিয়া সে এমনি একটা অশিষ্ট ইঙ্গিত করিল যে, শাহ্জী চম্কাইয়া উঠিল।

তাহার একে নেশার ঘোর, তাহাতে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড; —সেই যে সাধু ভাষায় বলে 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়' হইয়া বসিয়া থাকা, ঠিক সেইভাবে ক্যাল্-ক্যাল্ করিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ইন্দ্র আমাকে লইয়া যখন দ্বারের বাহিরে আসিয়া পড়িল, তখন সে বোধ করি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিষ্কার বাঙলা করিয়া ডাকিল, শোনো ইন্দ্রনাথ, কি হয়েচে, বল ত? আমি তাহাকে এই প্রথম বাঙলা বলিতে শুনিলাম!

ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি কিচ্ছু জান না—কেন মিছামিছি আমাকে ধোঁকা দিয়ে এতদিন এত টাকা নিয়েচ, তার জবাব দাও।

সে কহিল, জানিনে তোমাকে কে বললে?

ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ ওই স্তব্ধ নতমুখী দিদির দিকে একটা হাত বাড়াইয়া বলিল, ওই বললে, তোমার কাণা-কড়ির বিদ্যে নেই! বিদ্যে আছে শুধু জুচ্চুরি করবার আর লোক ঠকাবার। এই তোমাদের ব্যবসা। মিথ্যাবাদী চোর!

শাহ্জীর চোখদুটা ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে যে কি ভীষণ প্রকৃতির লোক, সে পরিচয় তখনও জানিতাম না। শুধু তাহার সেই ভীষণ চোখের দৃষ্টিতেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল! লোকটা তাহার এলোমেলো জটাটা বাঁধিতে-বাঁধিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুমুখে আসিয়া কহিল, বলেচিস্ তুই?

দিদি তেমনি নতমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন।

ইন্দ্র আমাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, রাত্তির হচ্চে—চল না!

রাত্রি হইতেছে সত্য, কিন্তু আমার পা যে নড়ে না। কিন্তু ইন্দ্র

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না, আমাকে প্রায় জোর করিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল।

কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই শাহ্‌জীর কণ্ঠস্বর আবার কানে আসিল —কেন বললি ?

প্রশ্ন শুনিলাম বটে, কিন্তু প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইলাম না। আমরা আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই, অকস্মাৎ চারিদিকের সেই নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরিয়া একটা তীব্র আর্ত্তস্বর পিছনের আঁধার কুটীর হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের কানে বিঁধিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই ইন্দ্র সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু, আমার অদৃষ্টে অন্যরূপ ঘটিল। সুমুখেই একটা শিয়াকুল গাছের মস্ত ঝাড় ছিল, আমি সবেগে গিয়া তাহারই উপরে পড়িলাম। কাঁটায় সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। সে যাক—কিন্তু, নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতেই প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেল। এ কাঁটা ছাড়াই ত সে কাঁটায় কাপড় বাধে, সে কাঁটা ছাড়াই ত আর একটা কাঁটায় কাপড় আটকায়; এমনি করিয়া অনেক কষ্টে অনেক বিলম্বে যখন কোনমতে শাহ্‌জীর বাড়ীর প্রাঙ্গণের ধারে গিয়া পড়িলাম, তখন দেখি, সেই প্রাঙ্গণেরই একপ্রান্তে দিদি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন এবং আর এক প্রান্তে গুরু-শিষ্যের রীতিমত মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। পাশেই একটা তীক্ষ্ণধার বর্শা পড়িয়া আছে।

শাহ্‌জী লোকটা অত্যন্ত বলবান। কিন্তু ইন্দ্র যে তাহার অপেক্ষাও কত বেশী শক্তিশালী, এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না। থাকিলে বোধ হয়, সে এতবড় দুঃসাহসের পরিচয় দিত না। দেখিতে-দেখিতে ইন্দ্র তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া, তাহার বুকের উপর বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। সে এমনি টিপুনি যে, আমি বাধা না দিলে হয়ত সে যাত্রায় শাহ্‌জীর সাপুড়ে-যাত্রাটাই শেষ হইয়া যাইত।

বিস্তর টানা-হেঁচড়ার পর যখন উভয়কে পৃথক করিলাম, তখন ইন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলাম। অন্ধকারে প্রথমে নজর পড়ে নাই যে, তাহার সমস্ত কাপড়-জামা রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। ইন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল,—শালা গাঁজাখোর আমাকে সাপ-মারা বর্শা দিয়ে খোঁচা

মেরেচে—এই ছাখ্। জামার আস্তিন তুলিয়া দেখাইল, বাহুতে প্রায় দুই তিন ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত এবং তাহা দিয়া অজস্র রক্তস্রাব হইতেছে।

ইন্দ্র কহিল, কাঁদিস্‌নে—এই কাপড়টা দিয়ে খুব টেনে বেঁধে—এই খপরদার। ঠিক অমনি বসে থাকো। উঠলেই গলায় পা দিয়ে তোমার জিভ টেনে বা'র করব—হারামজাদা শূয়োর! নে, তুই টেনে বাঁধ্—দেরী করিস্‌নে! বলিয়া সে চড়্‌চড়্ করিয়া তাহার কোঁচার খানিকটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। আমি কম্পিতহস্তে ক্ষতটা বাঁধিতে লাগিলাম এবং শাহ্‌জী অদূরে বসিয়া মুমূর্ষু বিষাক্ত সর্পের দৃষ্টি দিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ইন্দ্র কহিল, না, তোমাকে বিশ্বাস নেই, তুমি খুন করতে পারো। আমি তোমার হাত বাঁধব।—বলিয়া তাহারই গেরুয়ারঙে ছোপানো পাগড়ি দিয়া টানিয়া-টানিয়া তাহার দুই হাত জড় করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সে বাধা দিল না, প্রতিবাদ করিল না, একটা কথা পর্যন্ত কহিল না।

যে লাঠিটার আঘাতে দিদি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া একপাশে রাখিয়া দিয়া ইন্দ্র কহিল, কি নিমকহারাম শয়তান এই ব্যাটা! বাবার কত টাকা যে চুরি করে একে দিয়েছি, আরও কত হয়ত দিতাম, যদি দিদি না আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করত। আর স্বচ্ছন্দে ও ঐ বল্লমটা আমাকে ছুঁড়ে মেরে বসল! শ্রীকান্ত, নজর রাখ্, যেন না ওঠে—আমি দিদির চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিই।

জলের ঝাপটা দিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, যেদিন থেকে দিদি বললে, ইন্দ্রনাথ, তোমার রোজগারের টাকা হলে নিতাম, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের ইহকাল-পরকাল মাটি করব না, সেইদিন থেকে ঐ শয়তান ব্যাটা দিদিকে কত মার মেরেছে, তার হিসেব-নিকেশ নেই। তবু দিদি ওকে কাঠ কুড়িয়ে, ঘুঁটে বেচে খাওয়াচ্চে, গাঁজার পয়সা দিচ্চে—তবু কিছুতে ওর হয় না। কিন্তু আমি একে পুলিশে দিয়ে তবে ছাড়ব—না হ'লে দিদিকে ও খুন ক'রে ফেলবে—ও খুন করতে পারে!

আমার মনে হইল, লোকটা যেন এই কথায় শিহরিয়া মুখ তুলিয়া

চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ মুখখানা নত করিয়া ফেলিল। সে একটি নিমেষ মাত্র ; কিন্তু অপরাধীর নিবিড় আশঙ্কা তাতে এমনি পরিস্ফুট হইতে দেখিয়াছিলাম যে, আমি আজও তাহার তখনকার সেই মুখের চেহারাটা স্পষ্ট মনে করিতে পারি।

আমি বেশ জানি, এই যে কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লোকে দ্বিধা ত করিবেই, পরন্তু, উদ্ভট-কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে হয়ত ইতস্ততঃ করিবে না। তথাপি এতটা জানিয়াও যে লিখিলাম, ইহাই অভিজ্ঞতার সত্যকার মূল্য। কারণ, সত্যের উপরে না দাঁড়াইতে পারিলে কোনমতেই এই সকল কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায় না। প্রতি পদেই ভয় হইতে থাকে, লোকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। জগতে বাস্তব ঘটনা যে কল্পনাকেও বহুদূর অতিক্রম করিয়া যায়, এ কৈফিয়ৎ নিজের কোন জোরই দেয় না, বরঞ্চ হাতের কমলটাকে প্রতি হাতেই টানিয়া টানিয়া ধরিতে থাকে।

যাক সে কথা। দিদি যখন চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন রাত্রি বোধ করি দ্বিপ্রহর। তাঁহার বিহ্বল ভাবটা ঘুচাইতে আরও ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। তারপরে আমার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া, ধীরে-ধীরে উঠিয়া গিয়া শাহ্‌জীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, যাও, শোও গে।

লোকটা ঘরে চলিয়া গেলে, তিনি ইন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া তাহার ডান হাতটা নিজের মাথার উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, ইন্দ্র, এই আমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ কর্ ভাই, আর কখনো এ বাড়ীতে আসিস্‌নে। আমাদের যা হবার হোক, তুই আমাদের কোন সংবাদ রাখিস্‌নে।

ইন্দ্র প্রথমটা অবাক হইয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, তা বটে! আমাকে খুন করতে গিয়েছিল, সেটা কিছু না। আর আমি যে ওকে বেঁধে রেখেচি, তাতেই তোমার এত রাগ। এমন না হ'লে কলিকাল বলেচে কেন? কিন্তু কি নেমক্‌হারাম তোমরা দু'জন! আয় শ্রীকান্ত, আর না।

দিদি চুপ করিয়া রহিলেন—একটি অভিযোগেরও প্রতিবাদ করিলেন না। কেন যে করিলেন না, তাহা পরে যত বেশীই বুঝিয়া থাকি না কেন

তখন বুঝি নাই। তথাপি, আমি অলক্ষ্যে নিঃশব্দে সেই টাকা পাঁচটি খুঁটির কাছে রাখিয়া দিয়া ইন্দ্রের অনুসরণ করিলাম। ইন্দ্র প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল, হিন্দুর মেয়ে হয়ে যে মোচলমানের সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তার আবার ধর্ম্মকর্ম্ম! চুলোয় যাও—আর আমি খোঁজ করব না, খবরও নেব না—হারামজাদা নচ্ছার! বলিয়া দ্রুতপদে বনপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

দু'জনে নৌকায় আসিয়া বসিলে ইন্দ্র নিঃশব্দে বাহিতে লাগিল এবং মাঝে-মাঝে হাত তুলিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে যে কাঁদিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া আর কোন প্রশ্ন করিলাম না।

শ্মশানের সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আসিলাম এবং সেই পথ দিয়াই এখনও চলিয়াছি; কিন্তু, কেন জানি না, আজ আর আমার ভয়ের কথাও মনে আসিল না। বোধ করি, মন আমার এমনি বিহ্বল আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, এত রাত্রে কেমন করিয়া বাড়ী ঢুকিব এবং ঢুকিলেও যে কি দশা হইবে, সে চিন্তাও মনে স্থান পাইল না।

প্রায় শেষ-রাত্রে নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। আমাকে নামাইয়া দিয়া ইন্দ্র কহিল, বাড়ী যা শ্রীকান্ত। তুই বড় অপয়া! তোকে সঙ্গে নিলেই একটা-না-একটা ফ্যাসাদ বাধে। আজ থেকে তোকে আর আমি কোন কাজে ডাকব না—তুইও আর আমার সামনে আসিস্‌নে। যা! বলিয়া সে গভীর জলে নৌকা ঠেলিয়া দেখিতে-দেখিতে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি বিস্মিত, ব্যথিত, স্তব্ধ হইয়া নির্জ্জন নদীতীরে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ছয়

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে মা-গঙ্গার উপকূলে ইন্দ্র যখন আমাকে নিতান্ত অকারণে একাকী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন কান্না আর আমি সামলাইতে পারিলাম না। তাহাকে যে ভালবাসিয়াছিলাম, সে তাহার

কোন মূল্যই দিল না। পরের বাড়ীর যে কঠিন শাসনপাশ উপেক্ষা করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাহারও এতটুকু মর্য্যাদা রাখিল না। উপরন্তু অপয়া, অকর্ম্মণ্য বলিয়া একান্ত অসহায় অবস্থায় বিদায় দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। তাহার এই নিষ্ঠুরতা আমাকে যে কত বিঁধিয়াছিল, তাহা বলিবার চেষ্টা করাও বাহুল্য। তারপরে, অনেকদিন সেও আর সন্ধান করিল না, আমিও না; দৈবাৎ পথে-ঘাটে যদি কখনও দেখা হইয়াছে, এমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া আমি চলিয়া গিয়াছি, যেন তাহাকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু আমার এই 'যেন'টা আমাকেই শুধু সারাদিন তুষের আগুনে দগ্ধ করিত, তাহার কতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত? ছেলে-মহলে সে একজন মস্ত লোক। ফুটবল-ক্রিকেটের দলের কর্ত্তা, জিমন্যাষ্টিকে আখড়ার মাষ্টার, তাহার কত অনুচর, কত ভক্ত! আমি ত তাহার তুলনায় কিছুই নয়। তবে—কেনই বা দু'দিনের পরিচয়ে আমাকে সে বন্ধু বলিয়া ডাকিল, কেনই বা বিসর্জ্জন দিল! কিন্তু সে যখন দিল, তখন আমিও টানাটানি করিয়া বাঁধিতে গেলাম না। আমার বেশ মনে পড়ে, আমাদের সঙ্গী-সাথীরা যখন ইন্দ্রের উল্লেখ করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে নানাবিধ অদ্ভুত আশ্চর্য্য গল্প সুরু করিয়া দিত, আমি চুপ করিয়া শুনিতাম। একটা কথার দ্বারাও কখনও ইহা প্রকাশ করি নাই যে, সে আমাকে চিনে, কিম্বা আমি তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানি। সেই বয়সেই আমি কেমন করিয়া যেন জানিতে পারিয়াছিলাম, 'বড়' ও 'ছোট'-র বন্ধুত্ব সচরাচর এমনি দাঁড়ায়। বোধ করি, ভাগ্যবশে পরবর্ত্তী জীবনে অনেক 'বড়' বন্ধুর সংস্পর্শে আসিব বলিয়াই ভগবান দয়া করিয়া এই সহজ জ্ঞানটা আমাকে দিয়াছিলেন যে, কখনও কোন কারণেই যেন অবস্থাকে ছাড়াইয়া বন্ধুত্বের মূল্য ধার্য্য করিতে না যাই। গেলেই যে দেখিতে-দেখিতে 'বন্ধু' প্রভু হইয়া দাঁড়ান এবং সাধের বন্ধুত্ব-পাশ দাসত্বের বেড়ী হইয়া 'ছোট'-র পায়ে বাজে, এই দিব্যজ্ঞানটি এত সহজে এমন সত্য করিয়াই শিখিয়াছিলাম বলিয়া লাঞ্ছনার হাত হইতে চিরদিনের মত নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিয়াছি।

তিন চারি মাস কাটিয়াছে। উভয়েই উভয়কে ত্যাগ করিয়াছি—তা' বেদনা একপক্ষের যত নিদারুণই হোক—কেহ কাহারও খোঁজ করি না।

দত্তদের বাড়ীতে কালীপূজা উপলক্ষে পাড়ার সখের থিয়েটারের ষ্টেজ াধা হইতেছে। মেঘনাদবধ হইবে। ইতিপূর্ব্বে পাড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দখিয়াছি, কিন্তু থিয়েটার বেশী চোখে দেখি নাই। সারাদিন আমার াওয়া-খাওয়াও নাই, বিশ্রামও নাই। ষ্টেজ-বাঁধার সাহায্য করিতে পাইয়া একেবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি; শুধু তাই নয়, যিনি রাম সাজিবেন, বয়ং তিনি সে দিন আমাকে একটা দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং ারি আশা করিয়াছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁড়া দিয়া গ্রীনরুমের মধ্যে উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব। হয়ত বা আমাকে দেখিলে এক-আধবার ভিতরে যাইতেও দিবেন। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! সমস্তদিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। ঘন্টার পর ঘন্টা গ্রীনরুমের দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম, রামচন্দ্র কতবার আসিলেন—গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনিতেও পারিলেন না। একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি-ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গিয়াছে!

রাত্রি দশটার পর থিয়েটারের পয়লা 'বেল' হইয়া গেলে, নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই হতশ্রদ্ধ হইয়া সুমুখে আসিয়া একটা জায়গা দখল করিয়া বসিলাম। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত অভিমান ভুলিয়া গেলাম! সে কি প্লে! জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এমনটি আর দেখিলাম না। মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্য্যয় কাণ্ড! তাঁহার ৪ হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা চার সাড়ে-চার হাত। সবাই বলিত, ারিলে গরুর গাড়ী ছাড়া উপায় নাই। অনেক দিনের কথা। আমার মস্ত ঘটনা মনে নাই। কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সে দিন যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের হারান পলসাঁই ভীম সাজিয়া মস্ত একটা সজিনার ডাল ঘাড়ে করিয়া দাঁত কিড়-মিড় করিয়াও তেমনটি করিতে পারিতেন না।

ড্রপ্-সিন উঠিয়াছে। বোধ করি বা তিনি লক্ষ্মণই হইবেন—অল্প স্বল্প

বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এমনি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। সমস্ত ষ্টেজটা মড়-মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল—ফুট-লাইটের গোটা-পাঁচ ছয় ল্যাম্প উল্টাইয়া নিবিয়া গেল—এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস্ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। তাহাকে বসিয়া পড়িবার জন্য কেহ বা সভয় চীৎকারে অনুনয় করিয়া উঠিল, কেহ বা সিন্ ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল—কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ কাহারও কোন কথায় বিচলিত হইল না। বাঁ হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া, পেন্টুলানের মুখ চাপিয়া, ডান হাতের শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু ধনুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল নয়,—শুধু ডান হাত এবং তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে! অবশেষে তাহাতেই জিত! বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

আনন্দের সীমা নাই—মগ্ন হইয়া দেখিতেছি এবং এই অপরূপ লড়াইয়ের জন্য মনে মনে তাঁহার শতকোটি প্রশংসা করিতেছি, এমন সময়ে পিঠের উপর একটা আঙ্গুলের চাপ পড়িল। মুখ ফিরাইয়া দেখি—ইন্দ্র। চুপি চুপি কহিল, আয় শ্রীকান্ত—দিদি একবার তোকে ডাকচেন। তড়িৎস্পৃষ্টের মত সোজা খাড়া হইয়া উঠিলাম। কোথায় তিনি?

বেরিয়ে আয় না—বলচি। পথে আসিয়া সে শুধু কহিল, আমার সঙ্গে আয়!—বলিয়া চলিতে লাগিল।

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাহার নৌকা বাধা আছে—নিঃশব্দে উভয়ে চড়িয়া বসিলাম, ইন্দ্র বাঁধন খুলিয়া দিল।

আবার সেই সমস্ত অন্ধকার বনের পথ বাহিয়া দুজনে শাহ্জীর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বোধ করি, রাত্রি [illegible] বেশী নাই।

একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া দিদি বসিয়া আছেন। তাঁহার ক্রোড়ের উপর শাহ্‌জীর মাথা। তাহার পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড গোখরা সাপ লম্বা হইয়া আছে।

দিদি মৃদুকণ্ঠে ঘটনাটা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। আজ দুপুরবেলা কাহার বাটীতে সাপ ধরিবার বায়না থাকে। সেখানে ঐ সাপটিকে ধরিয়া যাহা বক্‌সিস্ পায়, তাহাতে কোথা হইতে তাড়ি খাইয়া মাতাল হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ী ফিরিয়া, দিদির পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও সাপ খেলাইতে উদ্যত হয়। খেলাইয়াও ছিল। কিন্তু অবশেষে খেলা সাঙ্গ করিয়া তাহার লেজ ধরিয়া হাঁড়িতে পুরিবার সময় মদের ঝোঁকে মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুমকুড়ি দিয়া আদর করিতে গেলে, সেও আদর করিয়া শাহজীর গলার উপর তীব্র চুম্বন দিয়াছে।

দিদি তাঁহার মলিন অঞ্চল-প্রান্তে চোখ মুছিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, শ্রীকান্ত, তখনই কিন্তু তাঁর চৈতন্য হ'ল যে সময় আর বেশী নাই। বললেন, আয়, আমরা দু'জনে একসঙ্গেই যাই, ব'লে পা দিয়ে সাপটার মাথা চেপে ধ'রে দুই হাত দিয়ে তাকে টেনে-টেনে ঐ অতবড় ক'রে ফেলে দিলেন। তারপরে দু'জনেরই খেলা সাঙ্গ হ'ল। বলিয়া তিনি হাত দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে শাহ্‌জীর মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া, গভীর স্নেহে তাহার সুনীল ওষ্ঠাধরে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, যাক, ভালই হ'ল ইন্দ্রনাথ! ভগবানকে আমি এতটুকু দোষ দিইনে।

আমরা উভয়েই নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম; সে কণ্ঠস্বরে যে কি মর্ম্মান্তিক বেদনা, কি প্রার্থনা, কি সুনিবিড় অভিমান প্রকাশ পাইল, তাহা যে শুনিয়াছে, তাহার সাধ্য নাই যে, জীবনে বিস্মৃত হয়। কিন্তু কিসের জন্য এই অভিমান? প্রার্থনাই বা কাহার জন্য?

একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিলেন, তোমরা ছেলেমানুষ, কিন্তু তোমরা দুটি ছাড়া ত আমার আর কেউ নেই ভাই; তাই এই ভিক্ষে করি, এঁর একটু তোমরা উপায় ক'রে দিয়ে যাও। আঙ্গুল দিয়া কুটীরের দক্ষিণদিকের জঙ্গলটা নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওইখানে একটু জায়গা আছে, ইন্দ্রনাথ! আমি অনেকদিন ভেবেচি, যদি আমার মরণ হয়, ওইখানেই যেন শুয়ে

থাকতে পাই। সকাল হ'লে সেই জায়গাটুকুতে এঁকে শুইয়ে রেখো ভাই,—অনেক কষ্টই এ জীবনে ভোগ ক'রে গেছেন—তবু একটু শান্তি পাবেন।

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, শাহ্‌জীকে কি কবর দিতে হবে?

দিদি বলিলেন, মুসলমান যখন, তখন দিতে হবে বৈ কি ভাই!

ইন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিল, দিদি, তুমিও কি মুসলমান?

দিদি বলিলেন, হাঁ, মুসলমান বৈ কি!

উত্তর শুনিয়া ইন্দ্র কেমন যেন সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বেশ দেখিতে পাইলাম, এ জবাব সে আশা করে নাই। দিদিকে সে বাস্তবিকই ভালবাসিয়াছিল। তাই বোধ করি, মনের মধ্যে একটা গোপন আশা পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার দিদি তাহাদেরই একজন। আমার কিন্তু বিশ্বাস হইল না। তাঁহার নিজের মুখের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও কোনমতেই ভাবিতে পারিলাম না যে, তিনি হিন্দুকন্যা নহেন।

বাকী রাতটুকু কাটিয়া গেল, ইন্দ্র সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে কবর খুঁড়িয়া আসিল এবং তিনজনে আমরা ধরাধরি করিয়া শাহ্‌জীর মৃতদেহটা সমাহিত করিলাম। গঙ্গার ঠিক উপরেই কাঁকরের একটুখানি পাড় ভাঙ্গিয়া ঠিক যেন কাহারও শেষ-শয্যা বিছাইবার জন্যই এই স্থানটুকু প্রস্তুত হইয়াছিল। কুড়ি-পঁচিশ হাত নীচেই জাহ্নবী-মায়ের প্রবাহ—মাথার উপরে বন্য লতার আচ্ছাদন। প্রিয়বস্তুকে সযত্নে লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে! বড় ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে তিনজনে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম—আর একজন আমাদের কোলের কাছে মৃত্তিকাতলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ঘুমাইয়া রহিল। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই—নীচে মন্দ স্রোতা ভাগীরথীর কুলুকুলু শব্দ কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল—মাথার উপরে আশে-পাশে বনের পাখীরা প্রভাতী গাহিতে লাগিল। কাল যে ছিল, আজ সে নাই। কাল প্রভাতে কে ভাবিয়াছিল, আজ এমনি করিয়া আমাদের নিশাবসান হইবে! কে জানিত, একজনের শেষমুহূর্ত এত কাছেই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল!

হঠাৎ দিদি সেই গোরের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বিদীর্ণ কণ্ঠে কাঁদিয়া

উঠিলেন,—মা গঙ্গা, আমাকেও পায়ে স্থান দাও মা। আমার যে আর কোথাও জায়গা নেই। তাঁহার এই প্রার্থনা, এই নিবেদন যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক সত্য, তাহা তখনও তেমন বুঝিতে পারি নাই, যেমন দু'দিন পরে পারিয়াছিলাম। ইন্দ্র একবার আমার মুখের পানে চোখ তুলিল, তারপরে উঠিয়া গিয়া সেই আর্ত্ত নারীর ভূ-লুণ্ঠিত মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, তাঁহারই মত আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, দিদি, আমার কাছে তুমি চল—আমার মা এখনো বেঁচে আছেন, তিনি তোমাকে ফেলবেন না—কোলে টেনে নেবেন। তাঁর বড় মায়ার শরীর, একবার শুধু তাঁর কাছে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে চল। তুমি হিন্দুর মেয়ে দিদি, কিছুতেই মুসলমানী নও।

দিদি কথা কহিলেন না। মূর্চ্ছিতার মত কিছুক্ষণ তেমনি ভাবে পড়িয়া থাকিয়া শেষে উঠিয়া বসিলেন। তারপরে উঠিয়া আসিয়া তিনজনে গঙ্গাস্নান করিলাম। দিদি হাতের নোয়া জলে ফেলিয়া দিলেন, গালার চুড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। মাটী দিয়া সিঁথির সিন্দুর তুলিয়া ফেলিয়া সদ্য-বিধবার সাজে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন।

এতদিন পরে আজ তিনি প্রথমে বলিলেন যে, শাহ্‌জী তাঁর স্বামী ছিলেন।

ইন্দ্র কিন্তু কথাটা ঠিকমত মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না; সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কিন্তু তুমি যে হিন্দুর মেয়ে, দিদি!

দিদি বলিলেন, হাঁ বামুনের মেয়ে। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন!

ইন্দ্র ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া কহিল, জাত দিলেন কেন?

দিদি বলিলেন, সে কথা ঠিক জানিনে ভাই। কিন্তু, তিনি যখন দিলেন, তখন আমারও সেইসঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী বৈ ত নয়। নইলে আমি নিজ হ'তে জাতও দিইনি—কোনদিন কোন অনাচারও করিনি।

ইন্দ্র গাঢ়স্বরে কহিল, সে আমি দেখেচি দিদি! সেই জন্যেই আমার যখন তখন এই কথাই মনে হয়েছে, আমাকে মাপ কোরো দিদি, তুমি কি

ক'রে এর মধ্যে আছ, তোমার কেমন ক'রে এমন দুর্ম্মতি হয়েছিল! কিন্তু এখন আমি কোন কথা শুনব না, আমাদের বাড়ীতে তোমাকে যেতেই হবে। এখনি চল।

দিদি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন, পরে মুখ তুলিয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন, এখন আমি কোথাও যেতে পারিনে, ইন্দ্রনাথ!

কেন পার না, দিদি?

দিদি বলিলেন, আমি জানি, তিনি কিছু-কিছু দেনা রেখে গেছেন। সেগুলো শোধ না দেওয়া পর্য্যন্ত ত কোথাও নড়তে পারিনে।

ইন্দ্র হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল,—সে আমিও জানি। তাড়ির দোকানে, গাঁজার দোকানে তার দেনা; কিন্তু তোমার তাতে কি? কার সাধ্যি তোমার কাছে টাকা চাইতে পারে? তুমি চল আমার সঙ্গে, কে তোমায় আটকায় দেখি একবার।

অত দুঃখেও দিদি একটুখানি হাসিলেন। বলিলেন, ওরে পাগলা, যে আমাকে আটক ক'রে রাখবে, সে যে আমার নিজেরই ধর্ম্ম। স্বামীর ঋণ যে আমার নিজেরই ঋণ! সে পাওনাদারকে তুমি কি করে বাধা দেবে ভাই! তা হয় না। আজ তোমরা বাড়ী যাও—আমার অল্প-স্বল্প যা-কিছু আছে, বিক্রী ক'রে ধার শোধ দেবার চেষ্টা করি—কাল-পরশু একদিন এসো।

আমি এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলাম। এইবার কথা কহিলাম। বলিলাম, দিদি, আমার কাছে বাড়ীতে আরও চার-পাঁচটা টাকা আছে—নিয়ে আসব?

কথাটা শেষ না হইতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আমাকে ছোট ছেলেটির মত একেবারে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, আমার কপালের উপর তাঁহার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া, মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, না দাদা, আর এনে কাজ নেই। তুমি সেই যে টাকা পাঁচটি রেখে গিয়েছিলে, তোমার সে দয়া আমি মরণ পর্য্যন্ত মনে রাখব ভাই। আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই, তোমার বুকের ভিতরে ব'সে ভগবান চিরদিন যেন অমনি ক'রে দুঃখীর

জন্যে চোখের জল ফেলেন।—বলিতে-বলিতেই তাঁহার দু'চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বেলা আটটা-নয়টার সময় আমরা বাটীতে ফিরিতে উদ্যত হইলে, সেদিন তিনি সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিলেন। যাবার সময় ইন্দ্রের একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্তকে আশীর্ব্বাদ করলুম বটে, কিন্তু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, সে সাহস আমার হয় না। তুমি মানুষের আশীর্ব্বাদের বাইরে। তবে ভগবানের শ্রীচরণে তোমাকে মনে-মনে আজ সঁপে দিলুম। তিনি তোমাকে যেন আপনার ক'রে নেন।

ইন্দ্রকে তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র জোর করিয়া তাঁহার দুই পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, দিদি, এ জঙ্গলে তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে আমার কিছুতে মন সরচে না। আমার কি জানি কেন, কেবলিই মনে হচ্চে, তোমাকে আর দেখতে পাব না।

দিদি জবাব দিলেন না,—সহসা মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে-মুছিতে সেই বনপথ ধরিয়া তাঁহার শোকাচ্ছন্ন শূন্য কুটীরে ফিরিয়া গেলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, তাঁহাকে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। কিন্তু একটিবারও আর তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না—তেম্নি মাথা নত করিয়া একভাবে দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেলেন। অথচ, কেন যে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না, তাহা দু'জনেই মনে-মনে অনুভব করিলাম।

তিনদিন পরে স্কুলের ছুটির পর বাহির হইয়াই দেখি, ইন্দ্র গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক, পায়ে জুতা নাই—হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলায় ভরা। এই অত্যন্ত দীন চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। বড়লোকের ছেলে, বাহিরে সে একটু বিশেষ বাবু। এমন অবস্থা তাহার আমি ত দেখিই নাই—বোধ করি, আর কেহও দেখে নাই। ইসারা করিয়া মাঠের দিকে আমাকে ডাকিয়া লইয়া ইন্দ্র বলিল,—দিদি নেই—কোথায় চলে গেছেন। আমার মুখের প্রতিও আর সে চাহিয়া দেখিল না। কহিল,

কাল থেকে আমি কত জায়গায় যে খুঁজেচি, কিন্তু দেখা পেলাম না। তোকে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন—এই নে, বলিয়া একখানা ভাঁজকরা হল্‌দে রঙের কাগজ আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়াই সে আর একদিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বোধ করি, হৃদয় তাহার এতই পীড়িত, এতই শোকাতুর হইয়াছিল যে কাহারও সঙ্গ বা কাহারও সহিত আলোচনা তাহার সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেইখানেই আমি ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ভাঁজ খুলিয়া কাগজখানি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিলাম। চিঠিতে যাহা লেখা ছিল, এতকাল পরে তাহার সমস্ত কথা যদিচ মনে নাই, তথাপি অনেক কথাই স্মরণ করিতে পারি। চিঠিতে লেখা ছিল, "শ্রীকান্ত, যাইবার সময় আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছি। শুধু আজ নয়, যতদিন বাঁচিব, ততদিন তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিব। কিন্তু, আমার জন্য তোমার দুঃখ করিও না। ইন্দ্রনাথ আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে, সে জানি; কিন্তু তুমি তাহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নিরস্ত করিও। আমার সমস্ত কথা যে আজই তোমরা বুঝিতে পারিবে, তাহা নয়; কিন্তু বড় হইলে একদিন বুঝিবে, সেই আশায় এই পত্র লিখিয়া গেলাম। কিন্তু নিজের কথা নিজের মুখেই ত তোমাদের কাছে বলিয়া যাইতে পারিতাম। অথচ কেন যে বলি নাই,—বলি-বলি করিয়াও কেন চুপ করিয়া গিয়াছি, সেই কথাটাই আজ না বলিতে পারিলে আর বলা হইবে না। আমার কথা—শুধু আমারই কথা নয় ভাই, সে আমার স্বামীর কথা। আবার তাও ভাল কথা নয়। এ-জন্মের পাপ যে আমার কত, তাহা ঠিক জানি না; কিন্তু পরজন্মের সঞ্চিত পাপের যে আমার সীমা-পরিসীমা নাই, তাহাতে ত কোন সংশয় নাই। তাই যখনই বলিতে চাহিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, স্ত্রী হইয়া নিজের মুখে স্বামীর নিন্দা-গ্লানি করিয়া সে পাপের বোঝা আর ভারাক্রান্ত করিব না। কিন্তু এখন তিনি পরলোকে গিয়াছেন। আর গিয়াছেন বলিয়াই যে, বলিতে আর দোষ নাই, সে মনে করি না। অথচ কেন জানি না, আমার এই অন্তবিহীন দুঃখের কথাগুলো তোমাদের না জানাইয়াও কোনমতে বিদায় হইতে পারিতেছি না। শ্রীকান্ত, তোমার এই দুঃখিনী দিদির নাম অন্নদা। স্বামীর নাম

কেন গোপন করিয়া গেলাম, তাহার কারণ—এই লেখাটুকুর শেষ পর্য্যন্ত পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। আমার বাবা বড়লোক। তাঁর ছেলে ছিল না। আমরা দুটি বোন। সেইজন্য বাবা দরিদ্রের গৃহ হইতে স্বামীকে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু মানুষ করিতে পারেন নাই। আমার বড় বোন বিধবা হইয়া বাড়ীতেই ছিলেন—ইঁহাকেই হত্যা করিয়া স্বামী নিরুদ্দেশ হ'ন! এ দুষ্কর্ম্ম কেন করিয়াছিলেন, তাহার হেতু তুমি ছেলেমানুষ, আজ না বুঝিতে পারিলেও একদিন বুঝিবে। সে যাই হোক্, বল ত, শ্রীকান্ত, এ দুঃখ কত বড়। এ লজ্জা কি মর্ম্মান্তিক! তবুও তোমার দিদি সব সহিয়াছিল। কিন্তু স্বামী হইয়া যে অপমানের আগুন তিনি তাঁর স্ত্রীর বুকের মধ্যে জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সে জ্বালা আজও তোমার দিদির থামে নাই। যাক সে কথা। তার পরে সাত বৎসর পরে আবার দেখা পাই। যেমন বেশে তোমরা তাঁকে দেখিয়াছিলে, তেমনি বেশে আমাদেরই বাটীর সম্মুখে তিনি সাপ খেলাইতেছিলেন। তাঁকে আর কেহ চিনিতে পারে নাই, কিন্তু আমি পারিয়াছিলাম। আমার চক্ষুকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নাই। শুনি, এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জন্যই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিছে কথা। তবুও একদিন গভীর রাত্রে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া আমি স্বামীর জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু সবাই শুনিল, সবাই জানিল, অন্নদা কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এ কলঙ্কের বোঝা আমাকে চিরদিনই বহিয়া বেড়াইতে হইবে। কোন উপায় নাই। কারণ, স্বামী জীবিত থাকিতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারি নাই—পিতাকে চিনিতাম; তিনি কোনমতেই তাঁর সন্তানঘাতীকে ক্ষমা করিতেন না, কিন্তু আজ যদিও আর সে ভয় নাই—আজ গিয়া তাঁহাকে বলিতে পারি, কিন্তু এ গল্প এতদিন পরে কে বিশ্বাস করিবে? সুতরাং পিতৃগৃহে আমার আর স্থান নাই। তা' ছাড়া আমি আবার মুসলমানী!

এখানে স্বামীর ঋণ যাহা ছিল, পরিশোধ করিয়াছি। আমার কাছে লুকানো দু'টি সোনার মাকড়ি ছিল, তাহাই বেচিয়াছি, তুমি যে পাঁচটি

টাকা একদিন রাখিয়া গিয়াছিলে, তাহা খরচ করি নাই ; আমাদের বড় রাস্তার মোড়ের উপর যে মুদীর দোকান আছে, তাহার কর্ত্তার কাছে রাখিয়া দিয়াছি—চাহিলেই পাইবে। মনে দুঃখ করিওনা ভাই। টাকা কয়টি ফিরাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু তোমার ওই কচি বুকটুকু আমি বুকে পুরিয়া লইয়া গেলাম। আর এইটি তোমার দিদির আদেশ, শ্রীকান্ত, আমার কথা ভাবিয়া তোমরা মন খারাপ করিও না। মনে করিও, তোমার দিদি যেখানেই থাকুক, ভাল থাকিবে ; কেন না, দুঃখ সহিয়া-সহিয়া এখন কোন দুঃখই আর তার গায়ে লাগে না। তাকে কিছুতেই আর ব্যথা দিতে পারে না। আমার ভাই দুটি; তোমাদের আমি কি বলিয়া যে আশীর্ব্বাদ করিব খুঁজিয়া পাই না। তবে শুধু এই বলিয়া যাই—ভগবান পতিব্রতার যদি মুখ রাখেন, তোমাদের বন্ধুত্বটি যেন চিরদিন তিনি অক্ষয় করেন।

তোমাদের দিদি

অন্নদা।”

সাত

আজ একাকী গিয়া মুদির কাছে দাঁড়াইলাম। পরিচয় পাইয়া মুদী একটি ছোট ন্যাকড়া বাহির করিয়া গেরো খুলিয়া দুটি সোনার মাকড়ি এবং পাঁচটি টাকা বাহির করিল। টাকা কয়টি আমার হাতে দিয়া কহিল, বহু মাকড়ি দুইটি আমাকে একুশ টাকায় বিক্রী করিয়া শাহ্জীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানি না। এই বলিয়া সে কাহার কত ঋণ মুখে-মুখে একটা হিসাব দিয়া কহিল, যাবার সময় বহুর হাতে সাড়ে-পাঁচ আনা পয়সা ছিল। অর্থাৎ বাইশটি মাত্র পয়সা অবলম্বন করিয়া এই নিরুপায় নিরাশ্রয় রমণী সংসারের সুদুর্গম পথে একাকী যাত্রা করিয়াছেন। পাছে তাঁহার সেই স্নেহাস্পদ বালক দুইটি তাঁহাকে আশ্রয় দিবার ব্যর্থ প্রয়াসে, উপায়হীন বেদনায় ব্যথিত হয়, এই ভয়ে নিঃশব্দে অলক্ষ্যে বাহির হইয়া গিয়াছেন—কোথায়, কাহাকেও

জানিতে পর্য্যন্ত দেন নাই। না দিন, কিন্তু আমার টাকা পাঁচটি নিলেন না। অথচ নিয়াছেন মনে করিয়া আমি আনন্দে, গর্ব্বে কতদিন কত আকাশকুসুম সৃষ্টি করিয়াছিলাম—আজ সব আমার শূন্যে মিলাইয়া গেল। অভিমানে চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তাহাই এই বুড়ার কাছে লুকাইবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেলাম। বার বার বলিতে লাগিলাম, ইন্দ্রর কাছে তিনি কতই লইয়াছেন, কিন্তু আমার কাছে কিছুই লইলেন না—যাবার সময় না বলিয়া ফিরাইয়া দিয়া গেলেন।

কিন্তু এখন আর আমার মনে সে অভিমান নাই। বড় হইয়া বুঝিয়াছি, আমি এমন কি সুকৃতি করিয়াছি যে, তাঁহাকে দান করিতে পাইব। সেই জ্বলন্ত শিখায় যা আমি দিব,—তাহাই বুঝি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে! বলিয়াই দিদি আমার দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র! ইন্দ্র আর আমি কি এক ধাতুর প্রস্তুত যে, সে যেখানে দান করিবে, আমি সেখানে হাত বাড়াইব! তা ছাড়া ইহাও ত বুঝিতে পারি, দিদি কাহার মুখ চাহিয়া সেই ইন্দ্রের কাছেও হাত পাতিয়াছিলেন। যাক্ সে কথা।

তার পরে অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি; কিন্তু এই দুটো পোড়া চোখে আর কখনও তাঁহার দেখা পাই নাই। না পাই, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সেই প্রসন্ন হাসিমুখখানি চিরদিন তেম্‌নিই দেখিতে পাই। তাঁহার চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া যখনই মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করি, তখন এই একটা কথা আমার কেবল মনে হয়, ভগবান! এ তোমার কি বিচার! আমাদের এই সতী-সাবিত্রীর দেশে স্বামীর জন্য সহধর্ম্মিণীকে অপরিসীম দুঃখ দিয়া সতীর মাহাত্ম্য তুমি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া সংসারকে দেখাইয়াছ, তাহা জানি। তাঁদের সমস্ত দুঃখ-দৈন্যকে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিয়া জগতের সমস্ত নারীজাতিকে কর্ত্তব্যের ধ্রুবপথে আকর্ষণ করিতেছ—তোমার সে ইচ্ছাও বুঝিতে পারি; কিন্তু আমার এমন দিদির ভাগ্যে এতবড় বিড়ম্বনা নির্দ্দেশ করিয়া দিলে কেন? কিসের জন্য এতবড় সতীর কপালে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলে? কি না তুমি তাঁর নিলে? তাঁর জাতি নিলে, ধর্ম্ম নিলে—সমাজ, সংসার সম্ভ্রম সমস্তই নিলে। দুঃখ যত দিয়াছ, আমি

ত আজো তাহার সাক্ষী রহিয়াছি। এতেও দুঃখ করি না, জগদীশ্বর! কিন্তু যাঁর আসন সীতা, সাবিত্রী, সতীর সঙ্গেই—তাঁকে, তাঁর বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া? কুলটা বলিয়া! বেশ্যা বলিয়া! ইহাতে তোমারই বা কি লাভ? সংসারই বা পাইল কি?

হায় রে, কোথায় তাঁহার এইসব আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র এ যদি একবার জানিতে পারিতাম! সেদেশে যেখানে যতদূরেই হোক, এ দেশের বাহিরে হইলেও, হয়ত একদিন গিয়া হাজির হইয়া বলিয়া আসিতাম—এই তোমাদের অন্নদা! এই তাঁর অক্ষয় কাহিনী! তোমাদের যে মেয়েটিকে কুলত্যাগিনী বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছ, সকালবেলায় একবার তাঁর নামটাই লইও—অনেক দুষ্কৃতির হাত এড়াইতে পারিবে।

তবে, আমি একটা বস্তু লাভ করিয়াছি। পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি, নারীর কলঙ্ক আমি সহজে প্রত্যয় করিতে পারি না। আমার দিদিকে মনে পড়ে। যদি তাঁর ভাগ্যেও এতবড় দুর্নাম ঘটিতে পারে, তখন সংসারে পারে না কি? এক আমি, আর সেই সমস্ত কালের সমস্ত পাপ-পুণ্যের সাক্ষী, তিনি ছাড়া জগতে আর কেহ কি আছে, যে অন্নদাকে একটুখানি স্নেহের সঙ্গেও স্মরণ করিবে! তাই ভাবি, না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।

তারপর অনেকদিন ইন্দ্রকে আর দেখি নাই। গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গেলেই দেখি, তাহার ডিঙ্গি কূলে বাঁধা। জলে ভিজিতেছে, রৌদ্রে ফাটিতেছে। শুধু আর একটি দিন মাত্র আমরা উভয়ে সেই নৌকায় চড়িয়াছিলাম। সেই শেষ! তার পরে সেও আর চড়ে নাই, আমিও না। এই দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। শুধু আমাদের নৌকাযাত্রার সমাপ্তি বলিয়াই নয়; সেদিন অখণ্ড স্বার্থপরতার যে উৎকট দৃষ্টান্ত

দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা সহজে ভুলিতে পারি নাই। সেই কথাটাই বলিব।

সেদিন কন্‌কনে শীতের সন্ধ্যা। আগের দিন খুব এক-পশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায়, শীতটা যেন ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতেছিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চারিদিক জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কহিল ··তে থিয়েটার হবে, যাবি?

থিয়েটারের নামে একেবারেই লাফাই উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, তবে কাপড় প'রে শীগগির আমাদের বাড়ী আয়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানা র‍্যাপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। সেখানে যাইতে হইলে ট্রেনে যাইতে হয়। ভাবিলাম, উহাদের বাড়ীর গাড়ী করিয়া ষ্টেশনে যাইতে হইবে—তাই তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্র কহিল, তা নয়। আমরা ডিঙিতে যাব। আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ, গঙ্গায় উজান ঠেলিয়া যাইতে হইলে, বহু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয়ত বা সময়ে উপস্থিত হইতেই পারা যাইবে না। ইন্দ্র কহিল, ভয় নেই, জোর হাওয়া আছে, দেরী হবে না। আমার নতুনদা কলকাতা থেকে এসেচেন, তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান।

যাক্, দাঁড় বাঁধিয়া, পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছি—অনেক বিলম্বে ইন্দ্রের নতুনদা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। চাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু···অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিল্কের মোজা, চক্‌চকে পাম্পস্থ, আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত 'যাচ্ছেতাই' বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রের কাঁধে ভর দিয়া, আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

তোর নাম কি রে?

ভয়ে ভয়ে বলিলাম—শ্রীকান্ত।

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, আবার শ্রী—কান্ত-! শুধু কান্ত।

নে, তামাক সাজ্‌। ইন্দ্র, হুঁকো-কল্‌কে রাখলি কোথায়? ছোঁড়াটাকে দে, তামাক সাজুক।

ওরে বাবা! মানুষ, চাকরকেও ত এমন বিকট ভঙ্গী করিয়া কেহ আদেশ করে না! ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর, আমি তামাক সাজচি।

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। কারণ, তিনি ইন্দ্রের মাসতুতো ভাই, কলিকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এল-এ পাস করিয়াছেন। কিন্তু মনটা আমার বিগড়াইয়া গেল। তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্ন-মুখে টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিলেন, তুই থাকিস্ কোথায় রে কান্ত? তোর গায়ে ওটা কালোপানা কি রে? র‍্যাপার? আহা র‍্যাপারের কি শ্রী! তেলের গন্ধে ভূত পালায়! ফুট্‌চে—পেতে দে দেখি, বসি।

আমি দিচ্ছি, নতুনদা। আমার শীত করছে না—এই নাও, বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া মুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশস্ত নয়—আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল।

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, নতুনদা, এ যে ভারী মুস্কিল হ'ল; হাওয়া প'ড়ে গেল। আর ত পাল চলবে না!

নতুনদা জবাব দিলেন, এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক!

কলিকাতাবাসী নতুনদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল, দাঁড়! কারুর সাধ্যি নেই নতুনদা, এই রেত ঠেলে উজোন ব'য়ে যায়। আমাদের ফিরতে হবে।

প্রস্তাব শুনিয়া নতুনদা একমুহূর্ত্তেই একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন,—তবে আন্‌লি কেন হতভাগা? যেমন ক'রে হোক, তোকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমার থিয়েটারে হারমোনিয়ম বাজাতেই হবে—তারা বিশেষ ক'রে ধরেচে।

ইন্দ্র কহিল, তাদের বাজাবার লোক আছে নতুন-দা। তুমি না গেলেও আটকাবে না।

না! আটকাবে না? এই মেড়োর দেশের ছেলেরা বাজাবে হারমোনিয়ম! চল্, যেমন ক'রে পারিস্ নিয়ে চল্। বলিয়া তিনি যেরূপ মুখভঙ্গী করিলেন, তাহাতে আমার গা জ্বলিয়া গেল। ইহার বাজনা পরে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু সে কথায় আর প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্রর অবস্থা-সঙ্কট অনুভব করিয়া আমি আস্তে-আস্তে কহিলাম, ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না?

কথাটা শেষ হইতে না হইতেই আমি চমকিয়া উঠিলাম। তিনি এমনি দাঁত-মুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি আজিও মনে করিতে পারি। বলিলেন, তবে যাও না, টানো গে না হে! জানোয়ারের মত ব'সে থাকা হচ্ছে কেন?

তার পরে একবার ইন্দ্র, একবার আমি গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনো বা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া, কখনো বা নীচে নামিয়া এবং সময়ে-সময়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ধার ঘেঁষিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে-মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন—এতটুকু সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাঁকে হালটা ধরিতে বলায়, জবাব দিলেন, তিনি দস্তানা খুলে এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া ক'রতে পারবেন না।

ইন্দ্র বলিতে গেল, না খুলে—

হ্যাঁ! দামী দস্তানাটা মাটি ক'রে ফেলি আর কি! নে—যা করচিস্ কর্!

বস্তুতঃ, আমি এমন স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। তারই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের এত ক্লেশ সমস্ত চোখে দেখিয়াও তিনি এতটকু বিচলিত হইলেন না। অথচ, আমরা বয়সে তাঁহার অপেক্ষা কতই বা ছোট ছিলাম। পাছে এতটুকু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার অসুখ করে, পাছে একফোঁটা জল লাগিয়া দামী

ওভারকোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে নড়িলে-চড়িলে কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং অবিশ্রাম চেঁচামেচি করিয়া হুকুম করিতে লাগিলেন।

আরও বিপদ,—গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল এবং দেখিতে-দেখিতে সে ক্ষুধা অবিশ্রান্ত বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল। এদিকে চলিতে-চলিতে রাত্রিও প্রায় দশটা হইয়া গেছে—থিয়েটারে পৌঁছিতে রাত্রি দু'টা বাজিয়া যাইবে শুনিয়া, বাবু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাত্রি যখন এগারোটা, তখন কলিকাতার বাবু কাবু হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ রে ইন্দ্র, এ দিকে খোট্টা-মোট্টাদের বস্তি-টস্তি নেই? মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না?

ইন্দ্র কহিল, সাম্‌নেই একটা বেশ বড় বস্তি, নতুন-দা, সব জিনিষ পাওয়া যায়।

তবে লাগা লাগা—ওরে ছোঁড়া—এঃ—টান্ না একটু জোরে—ভাত খাস্‌নে? ইন্দ্র, বল্ না তোর ঐ ওটাকে, একটু জোর ক'রে টেনে নিয়ে চলুক।

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই তাহার জবাব দিলাম না। যেমন চলিতে-ছিলাম, তেমনিভাবেই অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখানে পাড়টা ঢালু এবং বিস্তৃত হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সঙ্কীর্ণ জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দু'জনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু কহিলেন, হাত-পা একটু খেলানো চাই। নামা দরকার। অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র-সৈকতে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দু'জনে তাঁহার ক্ষুধাশান্তির উদ্দেশ্যে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম। যদিচ, বুঝিয়াছিলাম, এত রাত্রে এই দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে আহার্য্য সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়, তথাপি চেষ্টা না করিয়াও ত নিস্তার ছিল না। অথচ, তাঁর একাকী থাকিতেও ইচ্ছা নাই। সে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া কহিল, চল না নতুন-দা,

একলা তোমার ভয় করবে—আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে; এখানে চোর-টোর নেই, ডিঙি কেউ নেবে না—চল।

নতুন-দা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, ভয়! আমরা দর্জ্জিপাড়ার ছেলে—যমকে ভয় করিনে, তা জানিস্। কিন্তু তা' ব'লে ছোটলোকদের ছোট পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো হয়। অথচ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়—আমি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত থাকি এবং তামাক সাজি।

কিন্তু আমি তাঁর ব্যবহারে মনে-মনে এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, ইন্দ্র আভাস দিলেও, আমি কিছুতেই একাকী এই লোকটার সংসর্গে থাকিতে রাজী হইলাম না। ইন্দ্রের সঙ্গেই প্রস্থান করিলাম।

দর্জ্জিপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন ঠুন্-ঠুন্ পেয়ালা—

আমরা অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকি-সুরে সঙ্গীতচর্চ্চা শুনিতে-শুনিতে গেলাম। ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে-মনে অতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ধীরে-ধীরে কহিল, এরা কলকাতার লোক কি না, জল-হাওয়া আমাদের মত সহ্য করতে পারে না—বুঝ্‌লি না শ্রীকান্ত!

আমি বলিলাম,—হুঁ।

ইন্দ্র তখন তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়—বোধ করি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্যই—দিতে-দিতে চলিল। তিনি অচিরেই বি-এ পাশ করিয়া ডেপুটি হইবেন, কথা-প্রসঙ্গে তাহাও কহিল। যাই হোক, এত দিন পরে, এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি, কিংবা আদৌ সে কাজ পাইয়াছেন কি না, সে সংবাদ জানি না। কিন্তু মনে হয় যেন, পাইয়াছেন, না হইলে বাঙালী ডেপুটির মাঝে-মাঝে এত সুখ্যাতি শুনিতে পাই কি করিয়া? তখন তাঁহার প্রথম যৌবন। শুনি, জীবনের এই সময়টায় না কি হৃদয়ের প্রশস্ততা, সমবেদনার ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পায়, এমন আর কোন কালে নয়। অথচ, ঘণ্টা-কয়েকের সংসর্গেই যে নমুনা তিনি দেখাইয়াছিলেন, এত কালের ব্যবধানেও তাহা ভুলিতে পারা গেল না। তবে

ভাগ্যে এমন সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে; না হইলে বহু পূর্ব্বেই সংসারটা রীতিমত একটা পুলিশ-থানায় পরিণত হইয়া যাইত। কিন্তু যাক্ সে কথা!

কিন্তু ভগবান্ও যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যক। এ অঞ্চলে পথ-ঘাট, দোকান-পত্র সমস্তই ইন্দ্রর জানা ছিল। সে গিয়া মুদীর দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের ভয়ে দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এই গভীরতা যে কিরূপ অতলস্পর্শী, সে কথা যাহার জানা নাই, তাহাকে লিখিয়া বুঝানো যায় না। ইহারা অম্লরোগী, নিষ্কর্ম্ম জমিদারও নয়, বহুভারাক্রান্ত কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙালী গৃহস্থও নয়। সুতরাং ঘুমাইতে জানে। দিনের বেলা খাটিয়া-খুটিয়া রাত্রিতে একবার 'চারপাই' আশ্রয় করিলে, ঘরে আগুন না দিয়া, শুধুমাত্র চেঁচামেচি ও দোর-নাড়ানাড়ি করিয়া জাগাইয়া দিব, এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জ্জুন জয়দ্রথবধের পরিবর্ত্তে করিয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকেও মিথ্যা প্রতিজ্ঞাপাপে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়।

তখন উভয়েই বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া এবং যত-প্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে, তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া আধঘণ্টা পরে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জন-শূন্য! জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই যে শূন্য! 'দজ্জিপাড়া'র চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ডিঙি যেমনি ছিল, তেমনি রহিয়াছে ইনি গেলেন কোথায়? দু'জনে প্রাণপণে চীৎকার করিলাম—নতুন-দা! কিন্তু কোথায় কে! ব্যাকুল আহ্বান শুধু বাম ও দক্ষিণের সু-উচ্চ পাড়ে ধাক্কা খাইয়া অস্পষ্ট হইয়া বারংবার ফিরিয়া আসিল। এ অঞ্চলে মাঝে-মাঝে শীতকালে বাঘের জনশ্রুতিও শোনা যাইত। গৃহস্থ কৃষকেরা দলবদ্ধ 'হুড়ার'-এর জ্বালায় সময়ে-সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। সহসা ইন্দ্র সেই কথাই বলিয়া বসিল, বাঘে নিলে না ত রে! ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—সে কি কথা! ইতিপূর্ব্বে তাঁহার নিরতিশয় অভদ্র

ব্যবহারে আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এত বড় অভিশাপ ত দিই নাই!

সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল, কিছু দূরে বালুর উপর কি একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাঁরই সেই বহুমূল্য পাম্প-সু'র এক পাটি। ইন্দ্র সেই ভিজা বালির উপরেই একেবারে শুইয়া পড়িল, শ্রীকান্ত রে! আমার মাসিমাও এসেচেন যে! আমি আর বাড়ী ফিরে যাব না। তখন ধীরে-ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা যখন মুদীর দোকানে দাঁড়াইয়া তাহাকে জাগ্রত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিলাম, তখন, এই দিকের কুকুরগুলোও যে সমবেত আর্ত্ত-চীৎকারে আমাদিগকে এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই গোচর করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল, তাহা জলের মত চোখে পড়িল! এখনও দূরে তাহাদের ডাক শুনা যাইতেছিল। সুতরাং আর সংশয়মাত্র রহিল না যে, নেকড়ে-গুলা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া যেখানে ভোজন করিতেছে, তাহারই আশে-পাশে দাঁড়াইয়া সেগুলা এখনও চেঁচাইয়া মরিতেছে।

অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি যাব।

আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম—পাগল হয়েচ ভাই!

ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না। ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া লগিটা তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল। একটা বড় ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বা হাতে লইয়া কহিল, তুই থাক্, শ্রীকান্ত; আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়ীতে খবর দিস্—আমি চললুম।

তাহার মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর, কিন্তু চোখ-দুটো জ্বলিতে লাগিল। তাহাকে আমি চিনিয়াছিলাম। এ তাহার নিরর্থক শূন্য আস্ফালন নয় যে, হাত ধরিয়া দু'টো ভয়ের কথা বলিলেই মিথ্যা দম্ভ মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবে। আমি নিশ্চয় জানিতাম, কোনমতেই তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে না—সে যাইবেই। ভয়ের সহিত যে চির-অপরিচিত, তাহাকে আমিই বা কেমন করিয়া, কি বলিয়া, বাধা দিব! যখন সে নিতান্তই চলিয়া যায়, তখন আর থাকিতে পারিলাম না—আমিও যা হোক একটা কিছু হাতে করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলাম।

এইবার ইন্দ্র মুখ ফিরাইয়া আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, তুই ক্ষেপেছিস্, শ্রীকান্ত? তোর দোষ কি? তুই কেন যাবি?

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া এক মুহূর্ত্তেই আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কোনমতে গোপন করিয়া বলিলাম, তোমারই বা দোষ কি ইন্দ্র? তুমিই বা কেন যাবে?

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার হাতের বাঁশটা টানিয়া লইয়া নৌকায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, আমারও দোষ নেই ভাই, আমিও নতুন-দাকে আন্‌তে চাইনি। কিন্তু, একলা ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে।

কিন্তু আমারও ত যাওয়া চাই। কারণ পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি, আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। অতএব বাঁশটা পুনরায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া দাঁড়াইলাম, এবং আর বাক্‌বিতণ্ডা না করিয়া উভয়েই ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইলাম।

ইন্দ্র কহিল, বালির ওপর দৌড়ানো যায় না—খবরদার, সে চেষ্টা করিস্‌নে। জলে গিয়ে পড়্‌বি।

সুমুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল, অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ সাতটা কুকুর চীৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া বাঘ ত দূরের কথা, একটা শৃগালও নাই। সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কি একটা কালোপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল—নতুন-দা!

নতুন-দা একগলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন,—এই যে আমি।

দু'জনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম; কুকুরগুলো সরিয়া দাঁড়াইল, এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠনিমজ্জিত মূর্চ্ছিতপ্রায় তাহার দর্জ্জিপাড়ার মাসতুত ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাঁহার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্প, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি,—ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে! আমরা গেলে,

সেই যে তিনি হাততালি দিয়া 'ঠুন্‌-ঠুন্‌-পেয়ালা' ধরিয়াছিলেন, খুব সম্ভব সেই সঙ্গীত-চর্চ্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলো দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং এই অশ্রুতপূর্ব্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব পোষাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন ; এবং এই দুর্দ্দান্ত শীতের রাত্রে তুষার-শীতলজলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া, এই অর্দ্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেও, সে রাত্রে আমাদিগকে কম মেহন্নত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, বাবু ডাঙায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, আমার একপাটি পাম্প!

সেটা ওখানে পড়িয়া আছে—সংবাদ দিতেই, তিনি সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া, তাহা অবিলম্বে হস্তগত করিবার জন্য সোজা খাড়া হইয়া উঠিলেন। তার পরে কোটের জন্য, গলাবন্ধের জন্য, মোজার জন্য, দস্তানার জন্য, একে একে পুনঃ-পুনঃ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং সে রাত্রে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ফিরিয়া গিয়া নিজেদের ঘাটে পৌঁছিতে পারিলাম, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল এই বলিয়া আমাদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন—কেন আমরা নির্ব্বোধের মত সে-সব তাঁহার গা হইতে তাড়াতাড়ি খুলিতে গিয়াছিলাম। না খুলিলে তা ধূলাবালি লাগিয়া এমন করিয়া মাটী হইতে পারিত না। আমরা খোট্টার দেশের লোক, আমরা চাষার সামিল, আমরা এসব কখনো চোখ্‌খে দেখি নাই—এ সমস্ত অবিশ্রাম বকিতে-বকিতে গেলেন। যে দেহটাতে ইতিপূর্ব্বে একটি ফোঁটা জল লাগাইতেও তিনি ভয়ে সারা হইতেছিলেন, জামা-কাপড়ের শোকে সে দেহটাকেও তিনি বিস্মৃত হইলেন। উপলক্ষ যে আসল বস্তুকেও কেমন করিয়া বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা এই সব লোকের সংসর্গে না আসিলে, এমন করিয়া চোখে পড়ে না।

রাত্রি দু'টার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। আমার যে র‍্যাপ্যারখানির বিকট গন্ধে কলিকাতার বাবু ইতিপূর্ব্বে মূর্চ্ছিত

হইতেছিলেন, সেইখানি গায়ে দিয়া, তাহারই অবিশ্রাম নিন্দা করিতে-করিতে, পা মুছিতেও ঘৃণা হয়, তাহা পুনঃ-পুনঃ শুনাইতে-শুনাইতে, ইন্দ্রের খানি পরিধান করিয়া তিনি সেযাত্রা আত্মরক্ষা করিয়া বাটী গেলেন। যাই হোক, তিনি যে দয়া করিয়া ব্যাঘ্র-কবলিত না হইয়া সশরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই অনুগ্রহের আনন্দেই আমরা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। এত উপদ্রব-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া, আজ নৌকা-চড়ার পরিসমাপ্তি করিয়া, এই দুর্জ্জয় শীতের রাত্রে কোঁচার খুঁটমাত্র অবলম্বন করিয়া, কাঁপিতে-কাঁপিতে বাটী ফিরিয়া গেলাম।

আট

লিখিতে বসিয়া আমি অনেক সময়েই আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি, এই সব এলোমেলো ঘটনা আমার মনের মধ্যে এমন করিয়া পরিপাটিভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল কে? যেমন করিয়া বলি, তেমন করিয়া ত তাহারা একটির পর একটি, শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই! আবার তাই কি সেই শিকলের সকল গ্রন্থিগুলিই বজায় আছে? তাও ত নাই। কত হারাইয়া গিয়াছে টের পাই—কিন্তু, তবু ত শিকল ছিঁড়িয়া যায় না। কে তবে নূতন করিয়া এসব জোড়া দিয়া রাখে?

আরও একটা বিস্ময়ের বস্তু আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, বড়দের চাপে ছোটরা গুঁড়াইয়া যায়। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে জীবনের প্রধান ও মুখ্য ঘটনাগুলিই ত কেবল মনে থাকিবারই কথা। কিন্তু তাও ত দেখি না। ছেলেবেলার কথা-প্রসঙ্গে হঠাৎ এক সময়ে দেখিতে পাই, স্মৃতির মন্দিরে অনেক তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনাও কেমন করিয়া না জানি বেশ বড় হইয়া জাঁকিয়া বসিয়া গিয়াছে এবং বড়রা ছোট হইয়া কবে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়া গেছে। অতএব, বলিবার সময়েও ঠিক তাহাই ঘটে। তুচ্ছ বড় হইয়া দেখা দেয়, বড় মনেও পড়ে না। অথচ, কেন যে এমন হয়, সে কৈফিয়ৎ আমি পাঠককে দিতে পারিব না,—শুধু যা ঘটে, তাহা জানাইয়া দিলাম।

এমনি একটা তুচ্ছ বিষয় যে মনের মধ্যে এতদিন নীরবে, এমন সঙ্গোপনে, এত বড় হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার সন্ধান পাইয়া আমি নিজেও বড় বিস্মিত হইয়া গেছি। সেইটাই আজ পাঠককে বলিব। অথচ, জিনিষটি ঠিক কি, তাহার সমস্ত পরিচয়টা না দেওয়া পর্য্যন্ত, চেহারাটা কিছুতেই পরিষ্কার হইবে না। কারণ, গোড়াতেই যদি বলি—সে একটা 'প্রেমের ইতিহাস'—মিথ্যাভাষণের পাপ তাতে হইবে না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা নিজের চেষ্টায় যতটা বড় হইয়া উঠিয়াছে, আমার ভাষাটা হয় ত তাহাকেও ডিঙ্গাইয়া যাইবে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্ক হইয়া বলা আবশ্যক।

সে বহুকাল পরের কথা। দিদির স্মৃতিটাও তখন ঝাপ্‌সা হইয়া গেছে। যাঁর মুখখানি মনে করিলেই, কি জানি কেন, প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা আপনি মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইত, সে দিদিকে আর তখন তেমন করিয়া মনে পড়িত না। এ সেই সময়ের কথা। এক রাজার ছেলের নিমন্ত্রণে তাঁর শিকার-পার্টিতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এঁর সঙ্গে অনেকদিন স্কুলে পড়িয়াছি, গোপনে অনেক আঁক কষিয়া দিয়াছি—তাই তখন ভারি ভাব ছিল। তার পরে এণ্ট্রান্স ক্লাস হইতে ছাড়াছাড়ি। রাজার ছেলেদের স্মৃতিশক্তি কম, তাও জানি। কিন্তু ইনি যে মনে করিয়া চিঠিপত্র লিখিতে শুরু করিবেন, সে ভাবি নি। মাঝে হঠাৎ একদিন দেখা। তখন সবে সাবালক হইয়াছেন। অনেক জমানো টাকা হাতে পড়িয়াছে এবং তার পরে --ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজার ছেলের কানে গিয়াছে—অতিরঞ্জিত হইয়াই গিয়াছে—রাইফেল চালাইতে আমার জুড়ি নাই, এবং আরও এত প্রকারের গুণগ্রামে ইতিমধ্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি যে, একমাত্র সাবালক রাজপুত্রেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু হইবার আমি উপযুক্ত। তবে কি না, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবেরা আপনার লোকের সুখ্যাতিটা একটু বাড়াইয়াই করে, না হইলে, সত্যসত্যই যে অতখানি বিদ্যা অমন বেশী পরিমাণে ঐ বয়সটাতেও অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলাম, সে অহঙ্কার করা আমার শোভা পায় না। অন্ততঃ একটু বিনয় থাকা ভাল।

কিন্তু যাক সে কথা। শাস্ত্রকারেরা বলেন, রাজা-রাজড়ার সাদর আহ্বান

কখনো উপেক্ষা করিবে না। হিঁদুর ছেলে, শাস্ত্র অমান্য করিতে ত আর পারি না। কাজেই গেলাম। ষ্টেশন হইতে দশ বারো ক্রোশ পথ গজ-পৃষ্ঠে গিয়া দেখি, হাঁ, রাজপুত্রের সাবালকের লক্ষণ বটে! গোটা-পাঁচেক তাঁবু পড়িয়াছে। একটা তাঁর নিজস্ব, একটা বন্ধুদের, একটা ভৃত্যদের. একটায় খাবার বন্দোবস্ত। আর একটা অমনি একটু দূরে সেটা দুই ভাগ করিয়া জন-দুই বাইজী ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গদের আড্ডা।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাজপুত্রের খাস-কামরায় অনেকক্ষণ হইতেই যে সঙ্গীতের বৈঠক বসিয়াছে, তাহা প্রবেশমাত্রই টের পাইলাম। রাজপুত্র অত্যন্ত সমাদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। এমন কি, আদরের আতিশয্যে দাঁড়াইবার আয়োজন করিয়া তিনি তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বন্ধু বান্ধবেরা বিহ্বল-কলকণ্ঠে সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু, সেটা, তাঁহাদের যে অবস্থা, তাহাতে অপরিচয়ের জন্য বাধে না।

এই বাইজীটি পাটনা হইতে অনেক টাকার সর্ত্তে দুই সপ্তাহের জন্য আসিয়াছেন। এইখানে রাজকুমার যে বিবেচনা এবং যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাইজী সুশ্রী, অতিশয় সুকণ্ঠ এবং গান গাহিতে জানে।

আমি প্রবেশ করিতেই গানটা থামিয়া গিয়াছিল। তার পরে সময়োচিত বাক্যালাপ ও আদব-কায়দা সমাপন করিতে কিছুক্ষণ গেল। রাজপুত্র অনুগ্রহ করিয়া আমাকে গান ফর্‌মাস করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজাজ্ঞা শুনিয়া প্রথমটা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণেই বুঝিলাম, এই সঙ্গীতের মজলিসে আমিই যাহোক্ একটু ঝাপ্‌সা দেখি, আর সবাই ছুঁচোর মত কাণা।

বাইজী প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পয়সার লোভে অনেক কাজই পারা যায় জানি; কিন্তু, এই নিরেটের দরবারে বীণা-বাজানো বাস্তবিকই এতক্ষণ তাহার একটা সুকঠিন কাজ হইতেছিল। এইবার একজন সমঝদার পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। তার পরে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত যেন শুদ্ধমাত্র আমার জন্যই, তাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সৌন্দর্য্য ও কণ্ঠের সমস্ত মাধুর্য্য দিয়া

আমার চারিদিকের এই সমস্ত কদর্য্য মদোন্মত্ততা ডুবাইয়া অবশেষে স্তব্ধ হইয়া আসিল।

বাইজী পাটনার লোক— নাম পিয়ারী। সে রাত্রে আমাকে সে যেমন করিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া গান শুনাইয়াছিল, বোধ করি, এমন আর সে কখনও শুনায় নাই। মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। গান থামিলে আমার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল,—বেশ!

পিয়ারী মুখ নীচু করিয়া হাসিল! তারপর দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল—সেলাম করিল না। মজলিস রাত্রির মত শেষ হইয়াছিল।

তখন দলের মধ্যে কেহ সুপ্ত, কেহ তন্দ্রাভিভূত—অধিকাংশই অচৈতন্য। নিজের তাঁবুতে যাইবার জন্য বাইজী যখন তাহার দলবল লইয়া বাহির হইতেছিল, আমি তখন আনন্দের আতিশয্যে হিন্দী করিয়া বলিয়া ফেলিলাম,—বাইজী, আমার বড় সৌভাগ্য যে, তোমার গান প্রত্যহ দু' সপ্তাহ ধ'রে শুনতে পাব।

বাইজী প্রথমটা থমকিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই একটু খানি কাছে সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া কহিল, টাকা নিয়েছি, আমাকে ত গাইতেই হবে; কিন্তু আপনি এই পনের-ষোল দিন ধ'রে এঁর মোসাহেবি করবেন? যান কালকেই বাড়ী চ'লে যান।

কথা শুনিয়া আমি হতবুদ্ধি, কাঠ হইয়া গেলাম এবং কি জবাব দিব, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্ব্বেই বাইজী বাহির হইয়া গেল।

সকালে সোরগোল করিয়া কুমারজী শিকারে বাহির হইলেন। মদ্য-মাংসের আয়োজনটাই সবচেয়ে বেশী। সঙ্গে জন-দশেক শিকারী অনুচর। বন্দুক পনেরটা— তার মধ্যে ছয়টা রাইফেল। স্থান— একটা আধশুক্নো নদীর উভয় তীর। এপারে গ্রাম, ওপারে বালুর চর। এপারে ক্রোশ ব্যাপিয়া বড় বড় শিমুল গাছ—ওপারে বালুর উপর স্থানে-স্থানে কাশ ও কুশের ঝোপ। এইখানে এই পনেরটা বন্দুক লইয়া শিকার করিতে

হইবে। শিমূল গাছে-গাছে ঘুঘু গোটা কয়েক দেখিলাম, মরা নদীর বাঁকের কাছটায়ও দুটো চকা চকী ভাসিতেছে বলিয়াই মনে হইল।

কে কোন্ দিকে যাইবেন, অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পরামর্শ করিতে করিতেই সবাই দুই এক পাত্র টানিয়া লইয়া দেহ ও মন বীরের মত করিয়া লইলেন। আমি বন্দুক রাখিয়া দিলাম। একে বাইজীর খোঁচা খাইয়া রাত্রি হইতেই মনটা বিকল হইয়াছিল। তাহাতে শিকারের ক্ষেত্র দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

কুমার প্রশ্ন করিলেন, কি হে কান্ত, তুমি যে বড় চুপচাপ? ও কি, বন্দুক রেখে দিলে যে!

আমি পাখী মারি না।

সে কি হে? কেন, কেন?

আমি গোঁফ ওঠবার পর থেকে আর ছররা দেওয়া বন্দুক ছুঁড়িনি—ও আমি ভুলে গেছি।

কুমার-সাহেব হাসিয়াই খুন। কিন্তু সে হাসির কতটা দ্রব্যগুণে, সে কথা অবশ্য আলাদা।

সূরযুর চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনিই এ দলের প্রধান শিকারী এবং রাজপুত্রের প্রিয় পার্শ্বচর। তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যের খ্যাতি আমি আসিয়াই শুনিয়াছিলাম। রুষ্ট হইয়া কহিলেন, চিড়িয়া শিকারমে কুছ্ সরম হ্যায়?

আমারও মেজাজ ত ভাল ছিল না। সুতরাং জবাব দিলাম, সবাইকার নেহি হ্যায়, কিন্তু আমার হ্যায়! যাক্, আমি তাবুতে ফিরিলাম; 'কুমার সাহেব—আমার শরীরটা ভাল নেই' বলিয়া ফিরিলাম। ইহাতে কে হাসিল, কে চোখ ঘুরাইল, কে মুখ ভ্যাঙাইল, তাহা চাহিয়াও দেখিলাম না।

তখন সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরিয়া ফরাসের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়াছি এবং আর এক পেয়ালা চা আদেশ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়াছি,—বেহারা আসিয়া সসম্ভ্রমে জানাইল, বাইজী একবার সাক্ষাৎ করিতে চায়। ঠিক এইটি আশাও করিতেছিলাম, আশঙ্কাও করিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন সাক্ষাৎ করিতে চায়।

তা' জানিনে।

তুমি কে ?

আমি বাইজীর খানসামা।

তুমি বাঙ্গালী ?

আজ্ঞে হাঁ—পরামাণিক। নাম রতন।

বাইজী হিন্দু ?

রতন হাসিয়া বলিল, নইলে থাক্‌ব কেন বাবু ?

আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া, তাঁবুর দরজা দেখাইয়া দিয়া রতন সরিয়া গেল। পর্দ্দা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বাইজী একাকিনী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কাল রাত্রে পেশোয়াজ ও ওড়নায় ঠিক চিনিতে পারি নাই—আজ দেখিয়াই টের পাইলাম, বাইজী যে-ই হোক, বাঙ্গালীর মেয়ে বটে। একখণ্ড মূল্যবান কার্পেটের উপর গরদের শাড়ী পরিয়া বাইজী বসিয়া আছে। ভিজা এলোচুল পিঠের ওপর ছড়ানো ; হাতের কাছে পানের সাজ-সরঞ্জাম, সুমুখে গুড়গুড়িতে তামাক সাজা। আমাকে দেখিয়া, গাত্রোত্থান করিয়া হাসিমুখে সুমুখে আসনটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, বোসো। তোমার সুমুখে তামাকটা খাবো না আর—ওরে রতন, গুড়গুড়িটা নিয়ে যা। ও কি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো না ?

রতন আসিয়া গুড়গুড়ি লইয়া গেল। বাইজী কহিল, তুমি তামাক খাও, তা জানি ; কিন্তু দেবো কিসে ? অন্য জায়গায় যা কর, তা কর ; কিন্তু আমি জেনে শুনে আমার গুড়গুড়িটা ত আর তোমাকে দিতে পারিনে। অচ্ছা, চুরুট আনিয়ে দিচ্চি—ওরে ও—

থাক্ থাক্ ; চুরুটে কাজ নেই, আমার পকেটেই আছে।

আছে ? বেশ, তা হ'লে ঠাণ্ডা হ'য়ে একটু বোসো, ঢের কথা আছে। ভগবান্ কখন যে কার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন, তা' কেউ বলতে পারে না। স্বপ্নের অগোচর। শিকারে গিয়েছিলে, হঠাৎ ফিরে এলে যে ?

ভালো লাগলো না।

না লাগবারই কথা। কি নিষ্ঠুর এই পুরুষমানুষ জাতটা। অনর্থক জীবহত্যা ক'রে কি আমোদ পায়, তা' তারাই জানে ! বাবা ভাল আছেন ?

বাবা মারা গেছেন।

মারা গেছেন! মা?

তিনি আগেই গেছেন।

ওঃ—তাইতেই, বলিয়া বাইজী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। একবার মনে হইল, তাহার চোখ দুটি যেন ছল্-ছল করিয়া উঠিল; কিন্তু সে হয় ত আমার মনের ভুল। কিন্তু, পরক্ষণেই যখন সে কথা কহিল, তখন আর ভুল রহিল না যে, এই মুখরা নারীর চটুল ও পরিহাস-লঘু কণ্ঠস্বর সত্য-সত্যই মৃদু এবং আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। কহিল, তা' হ'লে যত্ন-টত্ন কর্‌বার আর কেউ নেই বলো। পিসীমার ওখানেই আছ ত? নইলে আর থাকবেই বা কোথায়? বিয়ে হয়নি, সে ত দেখতেই পাচ্ছি। পড়াশুনা ক'রচ? না, তাও ঐ সঙ্গে শেষ ক'রে দিয়েচ?

এতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার কৌতূহল এবং প্রশ্নমালা আমি যথাসাধ্য সহ্য করিয়া গিয়াছি। কিন্তু শেষ কথাটায় কেমন যেন হঠাৎ অসহ্য হইয়া উঠিল। বিরক্ত এবং রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, আচ্ছা, কে তুমি? তোমাকে জীবনে কখনো দেখেছি ব'লেও মনে হয় না। আমার সম্বন্ধে এত কথা তুমি জান্‌তে চাইছই বা কেন? আর জেনেই বা তোমার লাভ কি?

বাইজী রাগ করিল না, হাসিল, কহিল, লাভ-ক্ষতিই কি সংসারে সব? মায়া মমতা, ভালবাসাটাসা কি কিছু নেই? আমার নাম পিয়ারী, কিন্তু আমার মুখ দেখেও যখন চিনতে পারলে না, এখন ছেলেবেলার ডাকনাম শুনেই কি আমাকে চিন্‌তে পারবে? তা'ছাড়া আমি তোমাদের —ও গ্রামের মেয়েও নই।

আচ্ছা, তোমাদের বাড়ী কোথায় বল?

না, সে আমি বোল্‌বো না।

তবে তোমার বাবার নাম কি বল?

বাইজী জিভ কাটিয়া কহিল, তিনি স্বর্গে গেছেন। ছি ছি, তাঁর নাম কি আর এ মুখে উচ্চারণ ক'রতে পারি?

আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, তা যদি না পারো, আমাকে চিন্‌লে কি ক'রে, সেকথা বোধ হয় উচ্চারণ ক'রতে দোষ হবে না?

পিয়ারী আমার মনের ভাব লক্ষ্য করিয়া আবার মুখ টিপিয়া হাসিল। কহিল, না, তাতে দোষ নেই. কিন্তু সে কি তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?

বল্লেই দেখ না?

পিয়ারী কহিল, তোমাকে চিনেছিলাম ঠাকুর, দুর্ব্বুদ্ধির তাড়ায়—আর কিসে? তুমি যত চোখের জল আমার ফেলিয়েছিলে, ভাগ্যি সূয্যিদেব তা শুকিয়ে নিয়েছেন, নইলে চোখের জলের একটা পুকুর হ'য়ে থাক্‌তো। বলি, বিশ্বাস ক'রতে পারো কি?

সত্যই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু, সে আমারই ভুল। তখন কিছুতেই মনে পড়িল না যে পিয়ারীর ঠোঁটের গঠনই এইরূপ—যেন সব কথাই সে তামাসা করিয়া বলিতেছে এবং মনে-মনে হাসিতেছে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার সত্য-সত্যই হাসিয়া উঠিল! কিন্তু এতক্ষণে, কেমন করিয়া জানি না, আমার সহসা মনে হইল, সে নিজের লজ্জিত অবস্থা যেন সামলাইয়া ফেলিল। সহাস্যে কহিল, না ঠাকুর, তোমাকে যত বোকা ভেবেছিলুম, তুমি তা নও। এ যে আমার একটা বলার ভঙ্গী, তা তুমি ঠিক ধরেচ। কিন্তু তাও বলি, তোমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমানও আমার এই কথাটা অবিশ্বাস ক'রতে পারে নি। তা এতই যদি বুদ্ধিমান, তবে মোসাহেবি ব্যবসাটা ধরা হ'ল কেন? এ চাকরী ত তোমাদের মত মানুষ দিয়ে হয় না। যাও, চট্‌পট স'রে পড়।

ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল; কিন্তু প্রকাশ পাইতে দিলাম না। সহজভাবে বলিলাম,—চাকরী যতদিন হয় ততদিনই ভাল। বোসে না থাকি বেগার খাটি—জানো ত? আচ্ছা, এখন উঠি। বাইরের লোক হয় ত বা কিছু মনে ক'রে বসবে।

পিয়ারী কহিল, করলে সে তো তোমার সৌভাগ্য, ঠাকুর! এ কি আর একটা আপশোষের কথা?

উত্তর না দিয়া আমি দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন সে অকস্মাৎ হাসির লহর তুলিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু দেখো ভাই আমার সেই

চোখের জলের গল্পটা যেন ভুলে যেয়ো না। বন্ধুমহলে, কুমার-সাহেবের দরবারে, প্রকাশ করলে—চাই কি তোমার নসিবটাই হয় ত ফিরে যেতে পারে।

আমি নিরুত্তরে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এই নির্লজ্জার হাসি এবং কদর্য্য পরিহাস আমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যেন বিছার কামড়ের মত জ্বলিতে লাগিল।

স্বস্থানে আসিয়া, এক পেয়ালা চা খাইয়া, চুরুট ধরাইয়া মাথা যথাসম্ভব ঠাণ্ডা করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কে এ? আমার পাঁচ বছর বয়সের ঘটনা পর্য্যন্ত আমি স্পষ্ট মনে করিতে পারি। কিন্তু অতীতের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিলাম, কোথাও এই পিয়ারীকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ, এ আমাকে বেশ চিনে! পিসীমার কথা পর্য্যন্ত জানে। আমি যে দরিদ্র, ইহাও তাহার অবিদিত নহে। সুতরাং আর কোন অভিসন্ধি থাকিতেই পারে না, অথচ, যেমন করিয়া পারে, আমাকে সে এখান হইতে তাড়াইতে চায়। কিন্তু কিসের জন্য? আমার থাকা-না-থাকায় ইহার কি? তখন কথায়-কথায় বলিয়াছিল, সংসারে লাভ-ক্ষতিই কি সমস্ত? ভালবাসাটাসা কিছু নাই? আমি যাহাকে কখনো চোখেও দেখি নাই, তাহার মুখের এই কথাটা মনে করিয়াও আমার হাসি পাইল; কিন্তু সমস্ত কথাবার্ত্তা ছাপাইয়া তাহার শেষ বিদ্রূপটা আমাকে যেন অবিশ্রান্ত মর্ম্মান্তিক করিয়া বিঁধিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় শিকারীর দল ফিরিয়া আসিল। চাকরের মুখে শুনিলাম, আট-টা ঘুঘুপাখী মারিয়া আনা হইয়াছে। কুমার ডাকিয়া পাঠাইলেন; অসুস্থতার ছুতা করিয়া বিছানায় পড়িয়াই রহিলাম; এবং এই ভাবেই অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পিয়ারীর গান এবং মাতালের বাহবা শুনিতে পাইলাম।

তার পরের তিনচারি দিন প্রায় একইভাবেই কাটিয়া গেল। 'প্রায়' বলিলাম—কারণ, এক শিকার করা ছাড়া আর সমস্তই একপ্রকার। পিয়ারীর অভিশাপ ফলিল না কি! প্রাণিহত্যার প্রতি আর কাহারো কোন উৎসাহই দেখিলাম না। কেহ তাঁবুর বাহির হইতেই যেন চাহে না। অথচ, আমাকেও ছাড়িয়া দেয় না! আমার পলাইবার আর যে কোন বিশেষ

কারণ ছিল, তাহা নয়। কিন্তু এই বাইজীর প্রতি আমার কি যে ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল ; সে হাজির হইলেই, আমাকে কিসে যেন মারিতে থাকিত—উঠিয়া গিয়া তবে স্বস্তি পাইতাম। উঠিতে না পারিলে, অন্ততঃ আর কোন দিকে মুখ ফিরাইয়া, কাহারো সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিতাম। অথচ, সে প্রতিমুহূর্ত্তেই আমার সহিত চোখোচোখি করিবার সহস্র কৌশল করিত, তাহাও টের পাইতাম। প্রথম দুই-একদিন সে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই পরিহাসের চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু আমার ভাব দেখিয়া সেও একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল।

সেদিন ছিল শনিবার। আমি আর কোনমতেই থাকিতে পারি না। খাওয়া-দাওয়ার পরেই রওনা হইয়া পড়িব স্থির হওয়ায়,—আজ সকাল হইতেই গান-বাজনার বৈঠক বসিয়া গিয়াছিল। শ্রান্ত হইয়া বাইজী গান থামাইয়াছে, হঠাৎ গল্পের সেরা গল্প—ভূতের গল্প উঠিয়া পড়িল। নিমিষে যে যেখানে ছিল, আগ্রহে বক্তাকে ঘেরিয়া ধরিল।

প্রথমটা আমি তাচ্ছিল্যভরেই শুনিতেছিলাম। কিন্তু শেষে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়া বসিলাম। বক্তা ছিলেন একজন গ্রামেরই হিন্দুস্থানী প্রবীণ ভদ্রলোক। গল্প কেমন করিয়া বলিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, প্রেত-যোনিতে যদি কাহারো সংশয় থাকে—যেন আজিকার এই শনিবার অমাবস্যা তিথিতে এই গ্রামে আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া যান। তিনি যে জাত, যেমন লোকই হৌন এবং যত ইচ্ছা লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, আজ রাত্রে মহাশ্মশানে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল হইবে না। আজিকার ঘোর রাত্রে সেই শ্মশানচারী প্রেতাত্মাকে শুধু যে চোখে দেখা যায়, তাহা নয় ; তাহার কণ্ঠস্বর শুনা যায় এবং ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বলা যায়।

আমি ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আপনি আমার কাছে আসুন।

আমি নিকটে সরিয়া গেলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন, আপনি বিশ্বাস করেন না ?

না !

কেন করেন না? না করার বিশেষ কোন হেতু আছে?

না।

তবে? এই গ্রামেই এমন দুই-একজন সিদ্ধ সাধক আছেন, যাঁরা চোখে দেখেছেন। তবুও যে আপনারা বিশ্বাস করেন না, মুখের উপর হাসেন, সে শুধু দু'পাতা ইংরিজী পড়ার ফল। বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা ত নাস্তিক—ম্লেচ্ছ।

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল দেখিয়া, আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। বলিলাম, দেখুন, এ সম্বন্ধে আমি তর্ক করতে চাইনে। আমার বিশ্বাস আমার কাছে। আমি নাস্তিকই হই, ম্লেচ্ছই হই, ভূত মানিনে। যাঁরা চোখে দেখেছেন বলেন—হয় তাঁরা ঠকেচেন, না হয় তাঁরা মিথ্যাবাদী, এই আমার ধারণা।

ভদ্রলোক খপ্ করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, আপনি আজ রাত্রে শ্মশানে যেতে পারেন?

আমি হাসিয়া বলিলাম, পারি। আমি ছেলেবেলা থেকে অনেক শ্মশানেই রাত্রে গেছি।

বৃদ্ধ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'আপ্ সেখি মৎ করো বাবু', বলিয়া তিনি সমস্ত শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করিয়া, এই শ্মশানের মহা-ভয়াবহ বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। এ শ্মশান যে, যে-সে স্থান নয়, ইহা মহাশ্মশান, এখানে সহস্র নরমুণ্ড গণিয়া লইতে পারা যায়, এ শ্মশানে মহা-ভৈরবী তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া প্রত্যহ রাত্রে নরমুণ্ডের গেণ্ডুয়া খেলিয়া নৃত্য করিয়া বিচরণ করেন; তাঁহাদের খল্‌খল্ হাসির বিকট শব্দে কতবার কত অবিশ্বাসী ইংরাজ, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটেরও হৃৎস্পন্দন থামিয়া গিয়াছে—এমনি সব লোমহর্ষণ কাহিনী এমন করিয়াই বলিতে লাগিলেন যে, এত লোকের মধ্যে দিনেরবেলা তাঁবুর ভিতরে বসিয়া থাকিয়াও অনেকের মাথার চুল পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, পিয়ারী কোন্ এক সময়ে কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিয়াছে এবং কথাগুলো যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া গিলিতেছে।

এইরূপে এই মহাশ্মশানের ইতিহাস যখন শেষ হইল, তখন বক্তা

গর্ব্বভরে আমার প্রতি কটাক্ষ হানিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেয়া বাবুসাহেব, আপ্ যায়েগা ?

যায়েগা বৈ কি।

যায়েগা ? আচ্ছা, আপ্‌কা খুসি। প্রাণ জানেসে—

আমি হাসিয়া বলিলাম, না বাবুজী, না। প্রাণ গেলেও তোমাকে দোষ দেওয়া হবে না, তোমার ভয় নেই। কিন্তু অজানা জায়গায় আমিও ত শুধু-হাতে যাব না—বন্দুক নিয়ে যাব।

তখন আলোচনাটা একটু অতিমাত্রায় মুখর হইয়া উঠিল দেখিয়া আমি উঠিয়া গেলাম। আমি পাখী মারিতে পারি না, কিন্তু বন্দুকের গুলিতে ভূত মারিতে পারি ; বাঙ্গালীরা ইংরাজী পড়িয়া হিন্দুশাস্ত্র মানে না ; তাহারা মুরগী খায় ; তাহারা মুখে যত বড়াই করুক, কার্য্যকালে ভাগিয়া যায় ; তাহাদিগকে তাড়া দিলেই তাহাদের দাঁতকপাটি লাগে—এই প্রকারের সমালোচনা চলিতে লাগিল। অর্থাৎ যে সকল সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলে আমাদের রাজ-রাজড়াদের আনন্দোদয় হয় এবং তাঁহাদের মস্তিষ্ককে অতিক্রম করিয়া যায় না অর্থাৎ তাঁহারাও দু'কথা কহিতে পারেন, সেইসব কথাবার্ত্তা।

ইহাদের দলে শুধু একটিমাত্র লোক ছিল, যে স্বীকার করিয়াছিল,—সে শিকার করিতে জানে না, এবং কথাটাও সে সচরাচর একটু কম কহিত এবং মদটাও একটু কম করিয়া খাইত। তাহার নাম পুরুষোত্তম। সে সন্ধ্যার সময় আসিয়া আমাকে ধরিল—সঙ্গে যাইবে। কারণ, ইতিপূর্ব্বে সেও কোনদিন ভূত দেখে নাই। অতএব আজ যদি এমন সুবিধা ঘটিয়াছে, তবে ত্যাগ করিবে না, বলিয়া খুব হাসিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি ভূত মান না ?

একেবারে না।

কেন মান না ?

মানি না, নেই ব'লে ; এই বলিয়া সে প্রচলিত তর্ক তুলিয়া বারম্বার স্বীকার করিতে লাগিল।

আমি কিন্তু অত সহজে তাহাকে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিলাম না।

কারণ, বহুদিনের অভিজ্ঞতায় জানিয়াছিলাম, এ সকল যুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়—সংস্কার। বুদ্ধি দিয়া যাহারা একেবারেই মানে না, তাহারাও ভয়ের জায়গায় আসিয়া পড়িলে ভয়ে মূর্চ্ছা যায়।

পুরুষোত্তম কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে মালকোঁচা মারিয়া পাকা বাঁশের লাঠি ঘাড়ে ফেলিয়া কহিল, শ্রীকান্তবাবু, আপনার ইচ্ছা হয় বন্দুক নিন, কিন্তু আমাদের হাতে লাঠি থাক্‌তে ভূতই বল আর প্রেতই বল —কাউকে কাছে ঘেঁসতে দেব না।

কিন্তু সময়ে লাঠি হাতে থাক্‌বে ত?

ঠিক থাকবে বাবু, আপনি তখন দেখে নেবেন। এক ক্রোশ পথ— রাত্রি এগারোটার মধ্যেই রওনা হওয়া চাই।

দেখিলাম, তাহার আগ্রহটা যেন একটু অতিরিক্ত।

যাত্রা করিতে তখনও ঘণ্টাখানেক বিলম্ব আছে। আমি তাঁবুর বাহিরে পায়চারি করিয়া এই ব্যাপারটিই মনে-মনে আন্দোলন করিয়া দেখিতেছিলাম—জিনিসটা সম্ভবতঃ কি হইতে পারে। এ সকল বিষয়ে আমি যে লোকের শিষ্য, তাহাতে ভূতের ভয়টা আর ছিল না। ছেলে-বেলার কথা মনে পড়ে—সেই একটি রাত্রে যখন ইন্দ্র কহিয়াছিল, শ্রীকান্ত, মনে মনে রামনাম কর্। ছেলেটি আমার পিছনে বসিয়া আছে— সেইদিনই শুধু ভয়ে চৈতন্য হারাইয়াছিলাম, আর না। সুতরাং সে ভয় ছিল না। কিন্তু আজিকার গল্পটা যদি সত্যিই হয়, তাহা হইলে এটাই বা কি? ইন্দ্র নিজেও ভূত বিশ্বাস করিত। কিন্তু সেও কখনো চোখে দেখে নাই। আমি নিজেও মনে মনে যত অবিশ্বাসই করি, স্থান এবং কাল-মাহাত্ম্যে গা ছম্-ছম্ যে না করিত, তাহা নয়। সহসা সম্মুখের এই দুর্ভেদ্য অমাবস্যার অন্ধকারের পানে চাহিয়া আমার আর একটা অমা-রজনীর কথা মনে পড়িয়া গেল। সে দিনটাও এমনি শনিবারই ছিল।

বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্ব্বে আমাদের প্রতিবেশিনী হতভাগিনী নিরুদিদি বালবিধবা হইয়াও যখন সূতিকা-রোগে আক্রান্ত হইয়া ছয়মাস ভুগিয়া ভুগিয়া মরেন, তখন সেই মৃত্যুশয্যার পাশে আমি ছাড়া আর কেহ ছি না। বাগানের মধ্যে একখানি মাটীর ঘরে তিনি একাকিনী ব

করিতেন। সকলের সর্ব্বপ্রকার রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে এতবড় সেবাপরায়ণা নিঃস্বার্থ পরোপকারিণী রমণী পাড়ার মধ্যে আর কেহ ছিল না। কত মেয়েকে তিনি যে লেখাপড়া শিখাইয়া, সূচের কাজ শিখাইয়া, গৃহস্থালীর সর্ব্বপ্রকার দুরূহ কাজকর্ম্ম শিখাইয়া দিয়া, মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। একান্তস্নিগ্ধ, শান্তস্বভাব এবং সুনির্ম্মল চরিত্রের জন্য পাড়ার লোকও তাঁহাকে বড় কম ভালবাসিত না। কিন্তু, সেই নিরুদিদির ত্রিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ যখন পা-পিছলাইয়া গেল এবং ভগবান এই সুকঠিন ব্যাধির আঘাতে তাঁহার আজীবন-উঁচু মাথাটি একেবারে মাটীর সঙ্গে একাকার করিয়া দিলেন, তখন পাড়ার কোন লোকই দুর্ভাগিনীকে তুলিয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল না। দোষস্পর্শ-লেশহীন নির্ম্মল হিন্দুসমাজ হতভাগিনীর মুখের উপরেই তাহার সমস্ত-দরজা-জানালা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং, যে পাড়ার মধ্যে এমন একটি লোকও বোধ করি ছিল না যে, কোন-না-কোন প্রকারে নিরুদিদির সযত্ন-সেবা উপভোগ করে নাই। সেই পাড়ারই একপ্রান্তে অন্তিম-শয্যা পাতিয়া এই দুর্ভাগিনী ঘৃণায়, লজ্জায়, নিঃশব্দে, নতমুখে একাকিনী দিনের পর দিন ধরিয়া এই সুদীর্ঘ ছয়মাসকাল বিনা চিকিৎসায় তাহার পদস্খলনের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করিয়া, শ্রাবণের এক গভীর রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যে-লোকে চলিয়া গেলেন, তাহার অভ্রান্ত বিবরণ যে-কোনো স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত।

আমার পিসীমা যে অত্যন্ত সঙ্গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, এ-কথা আমি এবং বাটীর বুড়া ঝি ছাড়া আর জগতে কেহই জানে না। পিসীমা একদিন দুপুরবেলা আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, বাবা শ্রীকান্ত, তোরা ত এমন অনেকেরই রোগে শোকে গিয়ে দেখিস্, এই ছুঁড়ীটাকে এক-আধবার গিয়ে দেখিস্ না। সেই অবধি মাঝে-মাঝে গিয়া দেখিতাম এবং পিসীমার পয়সায় এটা-ওটা-সেটা কিনিয়া দিয়া আসিতাম। তাঁর শেষকালে একা আমিই কাছে ছিলাম। মরণকালে অমন পরিপূর্ণ বিকার এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান আমি আর দেখি নাই! বিশ্বাস না করিলেও যে ভয়ে গা ছম্-ছম্ করে, আমি সেই কথাটাই বলিতেছি।

সেদিন শ্রাবণের অমাবস্যা। রাত্রি বারোটার পর ঝড় এবং জলের প্রকোপে পৃথিবী যেন উপড়াইয়া যাইবার উপক্রম করিল। সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ ; আমি খাটের অদূরে বহুপ্রাচীন অর্দ্ধভগ্ন একটা ইজি-চেয়ারে শুইয়া আছি। নিরুদিদি স্বাভাবিক মুক্তকণ্ঠে আমাকে কাছে ডাকিয়া, হাত তুলিয়া আমার কাণটা তাঁর মুখের কাছে আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, শ্রীকান্ত, তুই বাড়ী যা।

সে কি নিরুদি, এই ঝড়-জলের মধ্যে ?

তা' হোক। প্রাণটা আগে!

ভুল বকিতেছে ভাবিয়া বলিলাম, আচ্ছা--জলটা একটু থামুক!

নিরুদিদি ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—না, না, শ্রীকান্ত তুই যা। যা ভাই—যা,--আর এতটুকু দেরী করিস্‌নে—তুই পালা।

এইবার তাঁর কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে আমার বুকের ভিতরটায় ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বলিলাম, আমাকে যেতে বলচ কেন?

প্রত্যুত্তরে তিনি আমার হাতটা টানিয়া লইয়া রুদ্ধ জানালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, যাবিনে, তবে কি প্রাণটা দিবি? দেখচিস্‌নে, আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কালো কালো সেপাই এসেচে? তুই আছিস্ ব'লে ঐ জানালা দিয়ে আমাকে শাসাচ্চে?

তার পরে সেই যে শুরু করিলেন---ওই খাটের তলায়! ওই মাথার শিয়রে! ওই মারতে আসচে! ওই নিলে! ওই ধরলে! এ চীৎকার শুধু থামিল শেষরাত্রে, যখন প্রাণটাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

ব্যাপারটা আজও আমার বুকের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া আছে। সে রাত্রে ভয় পাইয়াছিলাম ত বটেই, বোধ করি বা যেন কি-সব চেহারাও দেখিয়াছিলাম। এখন মনে করিয়া হাসি পায় সত্য ; কিন্তু সেদিন অমাবস্যার ঘোর দুর্য্যোগ তুচ্ছ করিয়াও বোধ করি বা ছুটিয়া পলাইতাম, যদি না একথা অসংশয়ে বিশ্বাস হইত—কপাট খুলিয়া বাহির হইলেই নিরুদিদির কালো কালো সেপাই-শান্ত্রীর ভিড়ের মধ্যে গিয়া পড়িব। অথচ এ-সব কিছুই নাই, কিছুই ছিল না, তাহাও জানিতাম ; মুমূর্ষু যে কেবলমাত্র নিদারুণ বিকারের ঘোরেই প্রলাপ বকিতেছিলেন, তাহাও বুঝিয়াছিলাম। অথচ—

বাবু!

চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, রতন।

কি রে?

বাইজী একবার প্রণাম জানাচ্চেন।

যেমন বিস্মিত হইলাম, তেমনি বিরক্ত হইলাম। এতরাত্রে অকস্মাৎ আহ্বান করাটা শুধু যে অত্যন্ত অপমানকর স্পর্দ্ধা বলিয়া মনে হইল, তাহা নয়, গত তিন-চারিদিনের উভয়পক্ষের ব্যবহারগুলো স্মরণ করিয়াও এই প্রণাম পাঠানোটা যেন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বলিয়া ঠেকিল। কিন্তু ভৃত্যের সম্মুখে কোনরূপ উত্তেজনা পাছে প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কায় নিজেকে প্রাণপণে সংবরণ করিয়া কহিলাম, আজ আমাব সময় নেই রতন, আমাকে বেরুতে হবে; কাল দেখা হবে।

রতন সুশিক্ষিত ভৃত্য, আদব-কায়দায় পাকা। সম্ভ্রমের সহিত মৃদুস্বরে কহিল, বড দবকাব বাবু, এখনি একবার পায়ের ধূলো দিতে হবে। নইলে বাইজীই আসবেন বললেন!

কি সর্ব্বনাশ! এই তাঁবুতে এত রাত্রে এত লোকের সমুখে। বলিলাম, তুমি বুঝিয়ে বলগে রতন, আজ নয়, কাল সকালেই দেখা হবে। আজ আমি কোনমতেই যেতে পাবব না!

রতন কহিল, তা' হ'লে তিনিই আসবেন। আমি এই পাঁচ বছব দেখে আসচি বাবু, বাইজীর কোনদিন কখনো এতটুকু কথার নড়-চড হয় না। আপনি না গেলে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

এই অন্যায় অসঙ্গত জিদ দেখিয়া পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল। বলিলাম, আচ্ছা দাঁড়াও, আমি আসচি। তাঁবুর ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বারুণীর কৃপায় জাগ্রত আর কেহ নাই। পুরুষোত্তম গভীর নিদ্রায় মগ্ন। চাকরদের তাঁবুতে দুই-চারিজন জাগিয়া আছে মাত্র। তাড়াতাড়ি বুটটা পবিয়া লইয়া একটা কোট গায়ে দিয়া ফেলিলাম। রাইফেল ঠিক করাই ছিল। হাতে লইয়া রতনের সঙ্গে সঙ্গে বাইজীর তাঁবুতে গিয়া প্রবেশ করিলাম। পিয়ারী সুমুখেই দাঁড়াইয়াছিল। আমার আপাদমস্তক বার-বার নিরীক্ষণ করিয়া, কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই,

ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল—শ্মশানে-টশানে তোমার কোনমতেই যাওয়া হবে না,—কোনমতেই না।

ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম,—কেন?

কেন আবার কি?—ভূত-প্রেত কি নেই যে, এই শনিবারের অমাবস্যায় তুমি যাবে শ্মশানে? প্রাণ নিয়ে কি তা হ'লে আর ফিরে আসতে হবে! —বলিয়াই পিয়ারী অকস্মাৎ ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি বিহ্বলের মত নিঃশব্দে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, কি করিব, কি জবাব দিব, ভাবিয়াই পাইলাম না। ভাবিয়া না পাওয়ার আর আশ্চর্য্য কি? যাহাকে চিনি না, জানি না, সে যদি উৎকট হিতাকাঙ্ক্ষায় দুপুর রাত্রে ডাকাইয়া আনিয়া সুমুখে দাঁড়াইয়া খামোকা কান্না জুড়িয়া দেয়—হতবুদ্ধি হয় না কে? আমার জবাব না পাইয়া পিয়ারী চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, তুমি কি কোনদিন শান্ত-সুবোধ হবে না? তেম্‌নি একগুঁয়ে হয়ে চিরকালটা কাটাবে? কই, যাও দিকি কেমন ক'রে যাবে? আমিও তা'হলে সঙ্গে যাবো, বলিয়া সে শালখানা কুড়াইয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইবার উপক্রম করিল।

আমি সংক্ষেপে কহিলাম, বেশ, চল।

আমার এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে জ্বলিয়া উঠিয়া পিয়ারী কহিল—আচ্ছা! দেশ-বিদেশে তা হ'লে সুখ্যাতির আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না! বাবু শিকারে এসে একটা বাইউলী সঙ্গে ক'রে দুপুর রাত্রে ভূত দেখতে গিয়েছিলেন। বলি, খাড়াতে কি একেবারে আউট্ হয়ে গেছ না কি? ঘেন্না-পিত্তি লজ্জা-সরম আর কিছু দেহতে নেই? বলিতে-বলিতেই তাহার তীব্র-কণ্ঠ ভিজিয়া যেন ভারী হইয়া উঠিল; কহিল, কখনো ত এমন ছিলে না। এত অধঃপাতে তুমি যেতে পারো, কেউ ত কোনদিন ভাবেনি।

তাহার শেষ কথাটায় অন্য কোন সময়ে আমার বিরক্তির হয়ত অবধি থাকিত না, কিন্তু এখন রাগ হইল না। মনে হইল পিয়ারীকে যেন চিনিয়াছি। কেন যে মনে হইল, তাহা পরে বলিতেছি। কহিলাম, লোকের ভাবাভাবির দাম কত, সে নিজেও ত জানো। তুমিই যে এত অধঃপাতে যাবে, সেই বা ক'জন ভেবেছিল?

মুহূর্তের জন্য পিয়ারীর মুখের উপর শরতের মেঘলা জ্যোৎস্নার মত একটা সহজ হাসির আভা দেখা দিল। কিন্তু সে ওই মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই সে ভীতস্বরে কহিল, আমার তুমি কি জান? কে আমি, বল ত দেখি?

তুমি পিয়ারী।

সে ত সবাই জানে।

সবাই যা জানে না, তা আমি জানি—শুনলে কি তুমি খুশী হবে? হোলে ত নিজেই তোমার পরিচয় দিতে। যখন দাওনি, তখন আমার মুখ থেকেও কোন কথা পাবে না। এর মধ্যে ভেবে দেখো, আত্মপ্রকাশ করবে কি না। কিন্তু এখন আর সময় নেই—আমি চললুম।

পিয়ারী বিদ্যুৎগতিতে পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যদি যেতে না দিই, জোর ক'রে যেতে পার?

কিন্তু যেতেই বা দেবে না কেন?

পিয়ারী কহিল—দেবই বা কেন? সত্যিকারের ভূত কি নেই যে, তুমি যাবে বললেই যেতে দেব? মাইরি, আমি চেঁচিয়ে হাট বাধাব—তা ব'লে দিচ্চি, বলিয়াই আমার বন্দুকটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। আমি এক পা পিছাইয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ হইতেই আমার বিরক্তির পরিবর্তে হাসি পাইতেছিল। এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিলাম, সত্যিকারের ভূত আছে কিনা, জানি না; কিন্তু মিথ্যাকারের ভূত আছে, জানি। তারা সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা কয়, কাঁদে, পথ আগলায়-এমন অনেক কীর্ত্তি করে, আবার দরকার হ'লে ঘাড় মট্‌কিয়েও খায়।

পিয়ারী মলিন হইয়া গেল এবং ক্ষণকালের জন্য বোধ করি বা কথা খুঁজিয়া পাইল না। তারপরে বলিল, আমাকে তাহ'লে তুমি চিনেচ বল। কিন্তু ওটা তোমার ভুল। তারা অনেক কীর্ত্তি করে সত্যি, কিন্তু ঘাড় মট্‌কাবার জন্যেই পথ আগলায় না। তাদেরও আপনার-পর বোধ আছে।

আমি পুনরায় সহাস্যে প্রশ্ন করিলাম, এ তো তোমার নিজের কথা, কিন্তু তুমি কি ভূত?

পিয়ারী কহিল, ভূত বই কি। যারা মরে গিয়েও মরে না, তারাই ভূত : এই ত তোমার বলবার কথা ? একটুখানি থামিয়া নিজেই পুনরায় কহিতে লাগিল, এক-হিসাবে আমি যে মরেছি, তা সত্যি। কিন্তু সত্যি হোক মিথ্যা হোক—নিজের মরণ আমি নিজে রটাইনি, মামাকে দিয়ে মা রটিয়েছিলেন। শুনবে সব কথা ?

তাহার মরণের কথা শুনিয়া এতক্ষণে আমার সংশয় কাটিয়া গেল। ঠিক চিনিতে পারিলাম—এই সেই রাজলক্ষ্মী! অনেক দিন পূর্ব্বে মায়ের সহিত সে তীর্থযাত্রা করিয়াছিল আর ফিরে নাই। কাশীতে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে—এই কথা মা গ্রামে আসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাহাকে কখনো যে আমি ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম—এ কথা মনে করিতে পারি নাই বটে ; কিন্তু তাহার একটি অভ্যাস আমি এখানে আসিয়া পর্য্যন্তই লক্ষ্য করিতেছিলাম। সে রাগিলেই দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিতেছিল কখন, কোথায়, কাহাকে যেন ঠিক এম্‌নিধারা করিতে অনেকবার দেখিয়াছি বলিয়া কেবলি মনে হইতেছিল ; কিন্তু কে সে, কোথায় দেখিয়াছি, কবে দেখিয়াছি—কিছুতেই মনে পড়িতেছিল না। সেই রাজলক্ষ্মী এই হইয়াছে দেখিয়া আমি ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। আমি যখন আমাদের গ্রামের মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার সর্দ্দার-পোড়ো সেই সময়ে ইহার দুই-পুরুষে কুলীন বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া ইহার মাকে তাড়াইয়া দেয়। স্বামীপরিত্যক্তা মা, সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী—দুই মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া আসে। ইহার বয়স তখন আট-নয় বৎসর ; সুরলক্ষ্মীর বারো-তেরো। ইহার রঙটা বরাবরই ফর্সা ; কিন্তু ম্যালেরিয়া ও প্লীহায় পেটটা ধামার মত, হাত-পা কাঠির মত মাথার চুলগুলো তামার শলার মত—কতগুলি তাহা গনিয়া বলা যাইতে পারিত। আমার মারের ভয়ে এই মেয়েটা বঁইচির বনে ঢুকিয়া প্রত্যহ একছড়া পাকা বঁইচি-ফলের মালা গাঁথিয়া আনিয়া আমাকে দিত। সেটা কোনদিন ছোট হইলেই, পুরানো পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া, ইহাকে প্রাণ ভরিয়া চপেটাঘাত করিতাম। মার খাইয়া এই মেয়েটা ঠোঁট কামড়াইয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিত ; কিন্তু কিছুতেই বলিত না—প্রত্যহ পাকা

ফল সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কত কঠিন। তা সে যাই হোক, এতদিন জানিতাম, মারের ভয়েই সে এত ক্লেশ স্বীকার করিত; কিন্তু আজ যেন হঠাৎ একটুখানি সংশয় হইল। তা সে যাক্। তার পরে ইহার বিবাহ। সেও এক চমৎকার ব্যাপার! ভাগ্নীদের বিবাহ হয় না, মামা ভাবিয়া খুন। দৈবাৎ জানা গেল, বিরিঞ্চি দত্তের পাচক-ব্রাহ্মণ ভঙ্গ-কুলীনের সন্তান। এই কুলীন-সন্তানকে দত্তমশাই বাঁকুড়া হইতে বদলী হইয়া আসার সময় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিরিঞ্চি দত্তের দুয়ারে মামা ধন্না দিয়া পড়িলেন— ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিতেই হইবে। এতদিন সবাই জানিত দত্তদের বামুনঠাকুর হাবা-গোবা ভালমানুষ। কিন্তু প্রয়োজনের সময় দেখা গেল, ঠাকুরের সাংসারিক-বুদ্ধি কাহারো অপেক্ষা কম নয়। একান্নো টাকা পণের কথায় সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, অত সস্তায় হবে না মশাই— বাজার যাচিয়ে দেখুন। পঞ্চাশ-এক টাকায় একজোড়া ভাল রামছাগলও পাওয়া যায় না—তা জামাই খুঁজছেন। একশ' একটি টাকা দিন একবার এ-পিঁড়িতে ব'সে, আর একবার ও-পিঁড়িতে ব'সে দুটো ফুল ফেলে দিচ্চি! দুটি ভাগ্নীই একসঙ্গে পার হবে। আর একশখানি টাকা—-দুটি ষাঁড় কেনার খরচাও দেবেন না? কথাটা অসঙ্গত নয়। তথাপি অনেক কষা-মাজা ও সহি-সুপারিশের পর সত্তর টাকায় রফা হইয়া একরাত্রে একসঙ্গে সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। দুই দিন পরে সত্তর টাকা নগদ লইয়া দু-পুরুষে কুলীন জামাই বাঁকুড়া প্রস্থান করিলেন। আর কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। বছর-দেড়েক পরে প্লীহা-জ্বরে সুরলক্ষ্মী মরিল এবং আরও বছর-দেড়েক পরে এই রাজলক্ষ্মী কাশীতে মরিয়া শিবত্ব লাভ করিল! এই ত পিয়ারী বাইজীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাইজী কহিল, তুমি কি ভাব্‌চ, ব'লব?

কি ভাবচি?

তুমি ভাব্‌চ, আহা! ছেলেবেলায় একে কত কষ্টই দিয়েচি! কাঁটার বনে পাঠিয়ে রোজ-রোজ বঁইচি তুলিয়েচি, আর তার বদলে শুধু মার-ধোর করেচি। মার খেয়ে চুপ ক'রে কেবল কেঁদেচে, কিন্তু কখনো কিছু চায়নি।

আজ যদি একটা কথা বল্‌চে ত শুনিই না। না হয়, নাই গেলাম শ্মশানে। এই না?

আমি হাসিয়া ফেলিলাম।

পিয়ারীও হাসিয়া কহিল, হবেই ত! ছেলেবেলায় একবার যাকে ভালবাসা যায়, তাকে কি কখনো ভোলা যায়? সে একটা অনুরোধ করলে কেউ কখনো কি পায়ে ঠেলে যেতে পারে? এমন নিষ্ঠুর সংসারে আর কে আছে? চল, একটু বসিগে, অনেক কথা আছে। রতন, বাবুর বুটটা খুলে দিয়ে যা রে। হাস্‌চ যে?

হাস্‌চি, কি ক'রে তোমরা মানুষ ভুলিয়ে বশ করো, তাই দেখে।

পিয়ারীও হাসিল, কহিল, তাই বই কি। পরকে কথায় ভুলিয়ে বশ করা যায়, কিন্তু, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত নিজেই যার বশ হয়ে আছি, তাকেও কি কথায় ভুলানো যায়? আচ্ছা, আজই না হয় কথা কইচি; কিন্তু প্রত্যহ কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যখন বঁইচির মালা গেঁথে দিতুম, তখন ক'টা কথা কয়েছিলুম শুনি? সেকি তোমার মায়ের ভয়ে নাকি? মনেও ক'রো না। সে মেয়ে রাজলক্ষ্মী নয়। কিন্তু ছিঃ! আমাকে তুমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে—দেখে চিনতে পারোওনি!—বলিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িতেই তাহার দুই কানের হীরাগুলা পর্য্যন্ত দুলিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, তোমাকে মনেই বা কবে করেছিলাম যে ভুলে যাবো না? বরং আজ চিনতে পেরেচি দেখে, নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। আচ্ছা, বারোটা বাজে—চললুম।

পিয়ারীর হাসিমুখ এক-নিমেষেই একেবারে বিবর্ণ ম্লান হইয়া গেল। একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিল, আচ্ছা, ভূতপ্রেত না মানো, সাপখোপ, বাঘভালুক, বুনোশূয়ার এগুলোকে ত বনে-জঙ্গলে অন্ধকার রাত্রে মানা চাই।

আমি বলিলাম, এগুলোকে আমি মেনে থাকি এবং যথেষ্ট সতর্ক হয়েও চলি।

আমাকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তুমি যে ধাতের মানুষ, তাতে তোমাকে যে আটকাতে পারব না, সে ভয় আমার খুবই

ছিল; তবু ভেবেছিলাম, কান্নাকাটি ক'রে হাতে-পায়ে ধরলে শেষ পর্য্যন্ত হয় ত না-ও যেতে পারো। কিন্তু আমার কান্নাই সার হ'ল! আমি জবাব দিলাম না দেখিয়া, পুনরায় কহিল, আচ্ছা, যাও, পিছু ডেকে আর অমঙ্গল ক'রব না। কিন্তু একটা কিছু হলে, এই বিদেশ-বিভুঁয়ে রাজা-রাজড়া বন্ধুবান্ধব কোন কাজেই লাগবে না, তখন আমাকেই ভুগতে হবে। আমাকে চিনতে পারো না, আমার মুখের পরে ব'লে তুমি পৌরুষী করে গেলে, কিন্তু আমার মেয়েমানুষের মন ত? বিপদের সময় আমি ত আর বলতে পারব না—এঁকে চিনিনে।—বলিয়া সে একটি দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল।

আমি যাইতে-যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিলাম। কেমন যেন একটা ক্লেশ বোধ হইল। বলিলাম, বেশ ত, বাইজী, সেও ত আমার একটা মস্ত লাভ! আমার কেউ কোথাও নেই—তবু ত জানতে, পারব, একজন আছে—যে আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

পিয়ারী কহিল, সে কি আর তুমি জানো না? একশ'বার 'বাইজী' ব'লে যত অপমানই করো না কেন, রাজলক্ষ্মী তোমাকে যে ফেলে যেতে পারবে না—এ কি আর তুমি মনে-মনে বোঝো না? কিন্তু ফেলে যেতে পারলেই ভাল হ'তো—তোমাদের একটা শিক্ষা হ'ত। কিন্তু কি বিশ্রী এই মেয়েমানুষ জাতটা; একবার যদি ভালবেসেচে, ত মরেচে!

আমি বলিলাম, পিয়ারী, ভাল সন্ন্যাসীতেও ভিক্ষা পায় না, কেন জানো?

পিয়ারী বলিল, জানি। কিন্তু তোমার এ খোঁচায় এত ধার নেই যে আমাকে বেঁধো। এ আমার ঈশ্বরদত্ত ধন। যখন সংসারের ভাল-মন্দ জ্ঞান পর্য্যন্ত হয়নি, তখনকার; আজকের নয়।

আমি নরম হইয়া বলিলাম,—বেশ কথা। আশা করি, আমার আজ একটা কিছু হবে। হ'লে তোমার ঈশ্বরদত্ত ধনের হাতে-হাতে একটা যাচাই হয়ে যাবে।

পিয়ারী কহিল,—দুর্গা, দুর্গা। ছিঃ! অমন কথা ব'লো না। ভালোয় ভালোয় ফিরে এস—এ সত্যি আর যাচাই ক'রে কাজ নেই। আমার কি

সেই কপাল যে, নিজের হাতে নেড়ে-চেড়ে, সেবা ক'রে দুঃসময়ে তোমাকে সুস্থ সবল ক'রে তুলব! তা হ'লে ত জানতুম, এ জন্মের একটা কাজ ক'রে নিলুম।—বলিয়া সে যে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু গোপন করিল, তাহা হারিকেনের ক্ষীণ আলোতেও টের পাইলাম।

'আচ্ছা, ভগবান্ তোমার এ সাধ হয় ত একদিন পূর্ণ ক'রে দেবেন' বলিয়া আমি আর দেরী না করিয়া তাঁবুর বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। তামাসা করিতে গিয়া যে মুখ দিয়া একটা প্রচণ্ড সত্য বাহির হইয়া গেল, সে কথা তখন আর কে ভাবিয়াছিল?

তাঁবুর ভিতর হইতে অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠের 'দুর্গা! 'দুর্গা'! নামের সকাতর ডাক কানে আসিয়া পৌঁছিল। আমি দ্রুতপদে শ্মশানের পথে প্রস্থান করিলাম।

সমস্ত মনটা পিয়ারীর কথাতেই আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কখন যে আমবাগানের দীর্ঘ অন্ধকার পথ পার হইয়া গেলাম, কখন নদীর ধারের সরকারী বাঁধের উপর আসিয়া পড়িলাম, জানিতে পারিলাম না। সমস্ত পথটা শুধু এই একটা কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছি—এ কি বিরাট্ অচিন্তনীয় ব্যাপার এই নারীর মনটা! কবে যে এই পীলে-রোগা মেয়েটা তাহার ধামার মত পেট এবং কাঠির মত হাত-পা লইয়া আমাকে প্রথম ভালবাসিয়াছিল এবং বঁইচি-ফলের মালা দিয়া তাহার দরিদ্র-পূজা নীরবে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিল, আমি টেরও পাই নাই; যখন টের পাইলাম তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। বিস্ময় সেজন্যও নয়। নভেল-নাটকেও বাল্যপ্রণয়ের কথা অনেক পড়িয়াছি। কিন্তু এই বস্তুটি, যাহাকে সে তাহার ঈশ্বরদত্ত ধন বলিয়া সগর্ব্বে প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হইল না, তাহাকে সে এতদিন তাহার এই ঘৃণিত জীবনের শত-কোটি মিথ্যা প্রণয়-অভিনয়ের মধ্যে কোন্খানে জীবিত রাখিয়াছিল? কোথা হইতে ইহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিত? কোন্ পথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিত?

বাপ্ !

চমকিয়া উঠিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, ধূসর বালুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং তাহাকেই বিদীর্ণ করিয়া শীর্ণ নদীর বক্ররেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া কোন্ সুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গেছে। সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক-একটা কাশের ঝোপ। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হইল, এগুলো যেন এক-একটা মানুষ—আজিকার এই ভয়ঙ্কর অমানিশায় প্রেতাত্মার নৃত্য দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে এবং বালুকার আস্তরণের উপর যে যাহার আসন গ্রহণ করিয়া নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছে। মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশে, সংখ্যাতীত গ্রহতারকাও আগ্রহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। হাওয়া নাই, শব্দ নাই, নিজের বুকের ভিতরটা ছাড়া, যতদূর চোখ যায়, কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া পর্য্যন্ত অনুভব করিবার জো নাই। যে রাত্রিচর পাখীটা একবার 'বাপ্' বলিয়াই থামিয়াছিল, সেও আর কথা কহিল না! পশ্চিমমুখে ধীরে-ধীরে চলিলাম—এই দিকেই সেই মহাশ্মশান। একদিন শিকারে আসিয়া সেই যে শিমূলগাছগুলা দেখিয়া গিয়াছিলাম, কিছুদূর আসিতেই তাহাদের কালো-কালো ডাল-পালা চোখে পড়িল। ইহারাই মহাশ্মশানের দ্বারপাল। ইহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এইবার অতি অস্ফুট প্রাণের সাড়া পাইতে লাগিলাম; কিন্তু তাহা আহ্লাদ করিবার মত নয়। আরও একটু অগ্রসর হইতে তাহা পরিস্ফুট হইল। এক-একটা মা 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' ঘুমাইলে তাহার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া-কাঁদিয়া শেষকালে নির্জ্জীব হইয়া যে প্রকারে রহিয়া-রহিয়া কাঁদে, ঠিক তেমনি করিয়া শ্মশানের একান্ত হইতে কে যেন কাঁদিতে লাগিল। যে এ ক্রন্দনের ইতিহাস জানে না এবং পূর্ব্বে শুনে নাই—সে যে এই গভীর অমানিশায় একাকী সেদিকে আর এক-পা অগ্রসর হইতে চাহিবে না, তাহা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। সে যে মানব-শিশু নয়, শকুন-শিশু —অন্ধকারে মাকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিতেছে,—না জানিলে কাহারো সাধ্য নাই এ-কথা ঠাহর করিয়া বলে। আরো কাছে আসিতে দেখিলাম —ঠিক তাই বটে। কালো-কালো ঝুড়ির মত শিমুলের ডালে ডালে

অসংখ্য শকুন রাত্রিবাস করিতেছে এবং তাহাদেরই কোন একটা দুষ্ট ছেলে অমন করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে।

গাছের উপরে সে কাঁদিতেই লাগিল, আমি নীচে দিয়া অগ্রসর হইয়া ঐ মহাশ্মশানের একপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সকালে তিনি যে বলিয়াছিলেন লক্ষ নরমুণ্ড গণিয়া লওয়া যায়,—দেখিলাম, কথাটা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়। সমস্ত স্থানটাই প্রায় নরকঙ্কালে খচিত হইয়া আছে। গেণ্ডুয়া খেলিবার নর-কপাল অসংখ্য পড়িয়া আছে, তবে খেলোয়াড়েরা তখনও আসিয়া জুটিতে পারেন নাই। আমি ছাড়া আর কোন অশরীরী দর্শক তথায় উপস্থিত ছিলেন কি না, এই দু'টা নশ্বর চক্ষে আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। তখন ঘোর অমাবস্যা। সুতরাং খেলা সুরু হইবার আর বেশী দেরী নাই আশা করিয়া, একটা বালুর ঢিপির উপর গিয়া চাপিয়া বসিলাম। বন্দুকটা খুলিয়া, টোটাটা আর একবার পরীক্ষা করিয়া, পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া, কোলের উপর রাখিয়া, প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। হায় রে টোটা! বিপদের সময় কিন্তু সে কোনই সাহায্য করিল না।

পিয়ারীর কথাটা মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল, যদি অকপটে বিশ্বাসই কর না, তবে কর্ম্মভোগ করিতে যাওয়া কেন? আর যদি বিশ্বাসের জোর না থাকে, তা হইলে ভূত-প্রেত থাক্ বা না থাক্ তোমাকে কিছুতেই যাইতে দিব না। সত্যই ত! এ কি দেখিতে আসিয়াছি? মনের অগোচরে ত পাপ নাই। আমি কিছুই দেখিতে আসি নাই। শুধু দেখাইতে আসিয়াছি– আমার সাহস কত। সকালে যাহারা বলিয়াছিল, ভীরু বাঙ্গালী কার্য্যকালে ভাগিয়া যায়, তাহাদের কাছে শুধু এই কথাটা সপ্রমাণ করা যে, বাঙ্গালী বড় বীর।

আমার বহুদিনের দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষ মরিলে আর বাঁচে না; এবং যদি বা বাঁচে, যে শ্মশানে তাহার পার্থিব দেহটাকে অশেষপ্রকারে নিপীড়িত করা হয়, সেইখানেই ফিরিয়া নিজের মাথাটায় লাথি মারিয়া-মারিয়া গড়াইয়া বেড়াইবার ইচ্ছা হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিকও নয়, উচিতও নয়। অন্ততঃ আমার পক্ষে ত নয়; তবে কি না, মানুষের রুচি ভিন্ন।

যদি বা কাহারো হয়, তাহা হইলে এমন একটা চমৎকার রাত্রে রাত্রি জাগিয়া আমার এতদূরে আসাটা নিষ্ফল হইবে না। অপিচ, এমনি একটা গুরুতর আশাই আজিকার প্রবীণ ব্যক্তিটি দিয়াছিলেন।

হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাস কতকগুলা ধূলা-বালি উড়াইয়া গায়ের উপর দিয়া বহিয়া গেল, এবং সেটা শেষ না হইতেই আর একটা এবং আর একটা বহিয়া গেল। মনে হইল, এ আবার কি? এতক্ষণ ত বাতাসের লেশমাত্র ছিল না! যতই কেন না বুঝি এবং বুঝাই, মরণের পরেও যে কিছু একটা অজানা-গোছের থাকে—এ সংস্কার হাড়ে-মাসে জড়ানো। যতক্ষণ হাড়-মাস আছে, ততক্ষণ সেও আছে—তা স্বীকার করি আর না-করি। সুতরাং এই দম্‌কা বাতাসটা শুধু ধূলা-বালিই উড়াইল না, আমার মজ্জাগত সেই গোপন সংস্কারে গিয়াও ঘা দিল। ক্রমশঃ ধীরে-ধীরে বেশ একটু জোরে হাওয়া উঠিল। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, মড়ার মাথার ভিতর দিয়া বাতাস বহিলে ঠিক দীর্ঘশ্বাস ফেলা গোছের শব্দ হয়। দেখিতে দেখিতে আশে-পাশে, সুমুখে, পিছনে, দীর্ঘশ্বাসের যেন ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। ঠিক মনে হইতে লাগিল, কত লোক যেন আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া, অবিশ্রাম হা-হুতাশ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছে; এবং ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'uncanny feeling' ঠিক সেই ধরণের একটা অস্বস্তি সমস্ত শরীরটাকে যেন গোটা-দুই ঝাঁকানি দিয়া গেল। সেই শকুনির বাচ্চাটা তখনও চুপ করে নাই, সে যেন পিছনে আরও বেশী করিয়া গোঙাইতে লাগিল। বুঝিলাম, ভয় পাইয়াছে। বহু অভিজ্ঞতার ফলে বেশ জানিতাম, এ যে-স্থানে আসিয়াছি এখানে এই বস্তুটাকে সময়ে চাপিতে না পারিলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ এইরূপ ভয়ানক জায়গায় ইতিপূর্ব্বে আমি কখনো একাকী আসি নাই। একাকী যে স্বচ্ছন্দে আসিতে পারিত, সে ইন্দ্র, আমি নয়। অনেকবার তাহার সঙ্গে অনেক ভয়ানক স্থানে গিয়া গিয়া আমারও একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে আমিও তাহার মত এই সব স্থানে একাকী আসিতে পারি। কিন্তু সেটা যে কতবড় ভ্রম এবং আমি যে শুধু ঝোঁকের উপরেই তাহাকে অনুকরণ করিতে

গিয়াছিলাম, একমুহূর্ত্তেই আজ তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমার সেই চওড়া বুক কই? আমার সে বিশ্বাস কোথায়? আমার সেই 'রাম'-নামের অভেদ্য কবচ কই? আমি ত ইন্দ্র নই যে, এই প্রেতভূমিতে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া, চোখ মেলিয়া, প্রেতাত্মার গেণ্ডুয়া-খেলা দেখিব? মনে হইতে লাগিল, একটা জীবন্ত বাঘ-ভালুক দেখিতে পাইলেও বুঝি বাঁচিয়া যাই হঠাৎ কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া আমার ডান কানের উপর নিশ্বাস ফেলিল। তাহা এমনি শীতল যে, তুষারকণার মত সেইখানেই জমিয়া উঠিল। ঘাড় না তুলিয়াও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, এ নিঃশ্বাস যে নাকের মস্ত ফুটাটা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে চামড়া নাই, মাংস নাই, একফোঁটা রক্তের সংস্রব পর্য্যন্ত নাই—কেবল হাড় আর গহ্বর! সুমুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে অন্ধকার! স্তব্ধ নিশীথ রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। আশে -পাশের হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ক্রমাগতই যেন হাতের কাছে ঘেঁসিয়া আসিতে লাগিল। কানের উপর তেমনি কন্‌কনে নিঃশ্বাসের বিরাম নাই। এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা আমাকে অবশ করিয়া আনিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, সমস্ত প্রেতলোকের ঠাণ্ডা হাওয়া যেন এই গহ্বরটা দিয়াই বহিয়া আসিয়া আমার গায়ে লাগিতেছে।

এত কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু এ-কথাটা ভুলি নাই যে, কোনমতেই চৈতন্য হারাইলে চলিবে না। তাহা হইলে মরণ অনিবার্য্য। দেখি, ডান পা-টা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। থামাইতে গেলাম, থামিল না। সে যেন আমার পা নয়।

ঠিক এমনি সময়ে অনেকদূরে অনেকগুলো গলার সমবেত চীৎকার কানে পৌঁছিল—বাবুজী! বাবুসাব! সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। কাহারা ডাকে? আবার চীৎকার করিল—গুলি ছুঁড়বেন না যেন। শব্দ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল—গোটা দুই ক্ষীণ আলোর রেখাও আড়-চোখে চাহিতে চোখে পড়িল। একবার মনে হইল, চীৎকারের মধ্যে যেন রতনের গলার আভাস পাইলাম। খানিক পরেই টের পাইলাম, সে-ই বটে। আর কিছুদুর অগ্রসর হইয়া, সে একটা শিমূলের আড়ালে দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া বলিল, বাবু, আপনি যেখানেই থাকুন, গুলিটুলি ছুঁড়বেন না—

আমরা রতন। রতন লোকটা যে সত্যই নাপিত তাহাতে আর ভুল নাই!

উল্লাসে চেঁচাইয়া সাড়া দিতে গেলাম, কিন্তু স্বর ফুটিল না। একটা প্রবাদ আছে, ভূত-প্রেত যাবার সময় কিছু একটা ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়। যে আমার পিছনে ছিল, সে আমার কণ্ঠস্বরটা ভাঙ্গিয়া দিয়াই বিদায় হইল।

রতন এবং আরও তিনজন লোক গোটা-দুই লণ্ঠন ও লাঠিসোটা হাতে করিয়া কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছটুলাল—সে তবলা বাজায়, এবং আর একজন পিয়ারীর দরওয়ান। তৃতীয় ব্যক্তি গ্রামের চৌকীদার।

রতন কহিল, চলুন, তিনটে বাজে।

চল, বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম। পথে যাইতে-যাইতে রতন বলিতে লাগিল,—বাবু, ধন্য আপনার সাহস! আমরা চারজনে যে কত ভয়ে-ভয়েই এসেচি, তা বলতে পারিনে।

এলি কেন?

রতন কহিল, টাকার লোভে। আমরা সবাই একমাসের মাইনে নগদ পেয়ে গেছি।—বলিয়া আমার পাশে আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিতে লাগিল,—বাবু, আপনি চ'লে এলে, গিয়ে দেখি, মা ব'সে ব'সে কাঁদচেন। আমাকে বললেন, রতন, কি হবে বাবা? তোরা পিছনে যা। আমি এক এক মাসের মাইনে তোদের বক্‌শিস্ দিচ্চি। আমি বললুম, ছটুলাল আর গণেশকে সঙ্গে নিয়ে আমি যেতে পারি মা; কিন্তু পথ ত চিনিনে। এমন সময় চৌকীদার হাঁক দিতেই মা বললেন, ওকে ডেকে আন রতন, ও নিশ্চয়ই পথ চেনে। বেরিয়ে গিয়ে ডেকে আনলুম। চৌকীদার ছ টাকা হাতে পেয়ে, তবে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। আচ্ছা বাবু, কচি-ছেলের কান্না শুনতে পেয়েচেন?—বলিয়া রতন শিহরিয়া উঠিয়া আমার কোটের পিছনটা চাপিয়া ধরিল, কহিল, আমাদের গণেশ পাঁড়ে বামুন মানুষ, তাই আজ রক্ষে পাওয়া গেছে, নইলে—

আমি কথা কহিলাম না। প্রতিবাদ করিয়া কাহারো ভুল ভাঙ্গিবার

মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। আচ্ছন্ন, অভিভূতের মত নিঃশব্দে প চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর আসার পর রতন প্রশ্ন করিল, আজ কিছু দেখতে পেলে বাবু?

আমি বললাম,—না।

আমার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে রতন ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, আমার যাওয়া আপনি কি রাগ করেচেন, বাবু? মা'র কান্না দেখলে কিন্তু—

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, না রতন, আমি একটুও রা করিনি।

তাঁবুর কাছাকাছি আসিয়া চৌকীদার তাহার কাজে চলিয়া গেল গণেশ ও ছট্টুলাল চাকরদের তাঁবুতে প্রস্থান করিল। রতন কহিল, ম বলেছিলেন, যাবার সময় একটিবার দেখা দিয়ে যেতে।

থমকিয়া দাঁড়াইলাম। চোখের উপর যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম পিয়ারী দীপের সম্মুখে অধীর আগ্রহে সজল চক্ষে বসিয়া প্রতীক্ষা করিয় আছে এবং আমার সমস্ত মনটা উন্মত্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহার পানে ছুটিয় চলিয়াছে।

রতন সবিনয়ে ডাকিল, আসুন!

মুহূর্ত্তকালের জন্য চোখ বুজিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে ডুব দিয় দেখিলাম, সেখানে প্রকৃতিস্থ কেহ নাই। সবাই আকণ্ঠ মদ খাইয়া মাতাল হইয়া উঠিয়াছে। ছি, ছি! এই মাতালের দল লইয়া যাইব দেখা করিতে! সে আমি কিছুতেই পারিব না।

বিলম্ব দেখিয়া রতন বিস্মিত হইয়া কহিল, ওখানে অন্ধকারে দাঁড়ালে কেন বাবু—আসুন?

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, না রতন, এখন নয়— চললুম।

রতন ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, মা কিন্তু পথ চেয়ে ব'সে আছেন—

পথ চেয়ে? তা হোক। তাঁকে আমার অসংখ্য নমস্কার দিয়ে ব'লো, কাল যাবার আগে দেখা হবে—এখন নয়; আমার বড় ঘুম

পয়েচে রতন, আমি চললুম। বলিয়া বিস্মিত, ক্ষুব্ধ রতনকে জবাব দিবার সময়মাত্র না দিয়া দ্রুতপদে ওদিকের তাঁবুর দিকে চলিয়া গেলাম।

নয়

মানুষের অন্তর জিনিষটিকে চিনিয়া লইয়া, তাহার বিচারের ভার অন্তর্য্যামীর উপর না দিয়া মানুষ যখন নিজেই গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন, আমি তেমন, এ-কাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিত না, সে-কাজ আমি মরিয়া গেলেও করিতাম না,—আমি শুনিয়া আর লজ্জায় বাঁচি না। আমার শুধু নিজের মনটাই নয়, পরের সম্বন্ধেও দেখি তাহার অহঙ্কারের অন্ত নাই। একবার সমালোচকের লেখাগুলা পড়িয়া দেখ—হাসিয়া আর বাঁচিবে না। কবিকে ছাপাইয়া তাহার কাব্যের মানুষটিকে চিনিয়া লয়। জোর করিয়া বলে, এ চরিত্র কোনমতেই ওরূপ হইতে পারে না, এ চরিত্র কখনও সেরূপ করিতে পারে না—এমনি কত কথা! লোকে বাহবা দিয়া বলে, বাঃ রে, বাঃ! এই ত ক্রিটিসিজম্! একেই ত বলে চরিত্র-সমালোচনা! সত্যই ত! অমুক সমালোচক বর্ত্তমান থাকিতে ছাই-পাঁশ যা-তা লিখিলেই কি চলিবে? এই দেখ, বইখানার যত ভুলভ্রান্তি সমস্ত তন্ন-তন্ন করিয়া ধরিয়া দিয়াছে। তা দিক। ত্রুটি আর কসে না থাকে! কিন্তু তবুও যে আমি নিজের জীবন আলোচনা করিয়া এই সব পড়িয়া, তাদের লজ্জায় আপনার মাথাটা তুলিতে পারি না। মনে-মনে বলি হা রে পোড়া কপাল! মানুষের অন্তর জিনিষটা যে অনন্ত, সে কি শুধু একটা মুখেরই কথা! দম্ভপ্রকাশের বেলায় কি তাহার কাণাকড়ির মূল্য নাই! তোমার কোটী কোটী জন্মের কত অসংখ্য কোটী অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ যাচাই করিবার জ্ঞানভাণ্ডারটুকু একমুহূর্ত্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে,

এ-কথাটা কি একটিবারও মনে পড়ে না ; এও কি মনে পড়ে না, এ সীমাহীন আত্মার আসন !

এই ত আমি অন্নদাদিদিকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার অম্লা দিব্যমূর্তি ত এখনো ভুলিয়া যাই নাই। দিদি যখন চলিয়া গেলেন, তখ কত গভীর স্তব্ধরাত্রে চোখের জলে বালিস ভাসিয়া গিয়াছে ; আর ম মনে বলিয়াছি, দিদি, নিজের জন্য আর ভাবি না, তোমার পরশমাণিব স্পর্শে আমার অন্তর-বাহিরের সব লোহা সোনা হইয়া গিয়াছে ; কোথাকা কোন জল-হাওয়ার দৌরাত্ম্যেই আর মরিচা লাগিয়া ক্ষয় পাইবার ভ নাই। কিন্তু কোথায় তুমি গেলে দিদি ! দিদি ! আর কাহাকেও সৌভাগ্যের ভাগ দিতে পারিলাম না। আর-কেহ তোমাকে দেখিতে পাইল না। পাইলে, যে-যেখানে আছে, সবাই যে সচ্চরিত্র সাধু হইয় যাইত, তাহাতে আমার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। কি উপায়ে ইহ সম্ভব হইতে পারিত, তখন এ লইয়া সারারাত্রি জাগিয়া ছেলেমানুষি কল্পনার বিরাম ছিল না। কখনো ভাবিতাম, দেবী-চৌধুরাণীর ম কোথাও যদি সাত ঘড়া মোহর পাই ত, অন্নদাদিদিকে একটা ম সিংহাসনে বসাই, বন কাটিয়া, জায়গা করিয়া, দেশের লোক ডাকিয়া তাঁ সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে জড় করি। কখনো ভাবিতাম, একটা প্রকাণ্ড বজরায় চাপাইয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া তাঁহাকে দেশ-বিদেশে লইয় বেড়াই। এমনি কত কি যে উদ্ভট আকাশকুসুমের মালা গাঁথা— সে সব মনে করিলেও এখন হাসি পায় ; চোখের জলও বড় ক পড়ে না।

তখন মনের মধ্যে এ বিশ্বাস হিমাচলের মত দৃঢ়ও ছিল—আমাকে ভুলাইতে পারে এমন নারী ত ইহলোকে নাই-ই, পরলোকে আছে কি ন তাহাও যেন ভাবিতে পারিতাম না। মনে করিতাম, জীবনে যদি কখনো কাহারো মুখে এমনি মৃদু কথা, ঠোঁটে এমনি মধুর হাসি, ললাটে এমনি অপরূপ আভা, চোখে এমনি সজল করুণ চাহনি দেখি, তবে চাহিয়া দেখিব। যাহাকে মন দিব, সেও যেন এমনি সতী, এমনি সাধ্বী হয় প্রতিপদক্ষেপে তাহারও যেন এমনি অনির্ব্বচনীয় মহিমা ফুটিয়া উঠে

এমনি করিয়া সে-ও যেন সংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত ভাল-মন্দ, সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াই গ্রহণ করিতে পারে।

সেই ত আমি! তবুও আজ সকালে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে-সঙ্গেই কাহার মুখের কথা, কাহার ঠোঁটের হাসি, কাহার চোখের জল মনে পড়িয়া বুকের একান্তে একটুখানি ব্যথা বাজিল? আমার সন্ন্যাসিনী দিদির সঙ্গে কোথাও কোন অংশে কি তাহার বিন্দু-পরিমাণও সাদৃশ্য ছিল? অথচ এম্‌নিই বটে। ছয়টা দিন আগে আমার অন্তর্য্যামী আসিয়াও যদি এ-কথা বলিয়া যাইতেন, আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিতাম, অন্তর্য্যামি! তোমার এই শুভকামনার জন্য তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু তুমি তোমার কাজে যাও, আমার জন্য চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। আমার বুকের কষ্টিপাথরে পাকা সোনায় কষ ধরানো আছে, সেখানে পিতলের দোকান খুলিলে খরিদ্দার জুটিবে না।

কিন্তু তবু ত খরিদ্দার জুটিল। আমার অন্তরের মধ্যে যেখানে অন্নদাদিদির আশীর্ব্বাদে পাকা সোনার ছড়াছড়ি, তার মধ্যেও যে এক দুর্ভাগা পিত্তলের লোভ সামলাইতে পারিল না, কিনিয়া বসিল,—এ কি কম আশ্চর্য্যের কথা!

আমি বেশ বুঝিতেছি, যাঁরা খুব কড়া সমঝদার, তাঁরা আমার আত্ম-কথার এইখানে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিবেন, বাপু, এত ফেনিয়ে কি বলতে চাও তুমি? বেশ স্পষ্ট ক'রেই বল না, সেটা কি? আজ ঘুম ভাঙ্গিয়াই পিয়ারীর মুখ মনে করিয়া তোমার ব্যথা বাজিয়াছিল— এই ত? যাহাকে মনের দোরগোড়া হইতে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিতেছিলে, আজ তাহাকেই ডাকিয়া ঘরে বসাইতে চাহিতেছ,—এই ত? তা বেশ। এ যদি সত্য হয়, তবে এর মধ্যে তোমার অন্নদাদিদির নামটা আর তুলিও না। কারণ, তুমি যত কথা যেমন করিয়াই সাজাইয়া বল না কেন, আমরা মানব-চরিত্র বুঝি! জোর করিয়া বলিতে পারি, সে সতী-সাধ্বীর আদর্শ তোমার মনের মধ্যে স্থায়ী হয় নাই, তাঁহাকে তোমার সমস্ত মন দিয়া কস্মিন্‌কালেও গ্রহণ করিতে পার নাই। পারিলে ঝুটায় তোমাকে ভুলাইতে পারিত না।

তা বটে। কিন্তু আর তর্ক নয়। আমি টের পাইয়াছি, মানুষ শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই নিজের সমস্ত পরিচয় পায় না। সে যা' নয়, তাই বলিয়া নিজেকে জানিয়া রাখে এবং বাহিরে প্রচার করিয়া শুধু বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে এবং যে দণ্ড ইহাতে দিতে হয়, তা নিতান্ত লঘুও নয়। কিন্তু থাক্, আমি ত নিজে জানি, আমি কোন্ নারীর আদর্শে এতদিন কি কথা 'প্রিচ' করিয়া বেড়াইয়াছি? সুতরাং আজ আমার এ দুর্গতির ইতিহাসে লোকে যখন বলিবে, শ্রীকান্তটা হম্‌বগ্— হিপোক্রিট্, তখন আমাকে চুপ করিয়াই শুনিতে হইবে। অথচ হিপোক্রিট্, আমি ছিলাম না; হম্‌বগ্ করা আমার স্বভাব নয়। আমার অপরাধ শুধু এই যে, আমার মধ্যে যে দুর্ব্বলতা আত্মগোপন করিয়া ছিল, তাহার সন্ধান রাখি নাই। আজ যখন সে সময় পাইয়া, মাথাঝাড়া দিয়া উঠিয়া, তাহারই মত আর একটা দুর্ব্বলতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া, একেবারে অন্দরের মধ্যে লইয়া বসাইয়া দিয়াছে, তখন অসহ্য বিস্ময়ে আমার চোখ দিয়া জল পড়িয়াছে; কিন্তু 'যাও' বলিয়া তাহাকে বিদায় দিতে পারি নাই। ইহাও জানিয়াছি, আজ আমার লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই নাই; কিন্তু পুলক যে হৃদয়ের কানায়-কানায় আজ ভরিয়া উঠিয়াছে! লোকসান যা হয়, তা হোক্, হৃদয় যে ইহাকে ত্যাগ করিতে চাহে না।

'বাবু-সাব্!' রাজভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। শয্যার উপর সোজা উঠিয়া বসিলাম। সে সসম্মানে নিবেদন করিল, কুমারসাহেব এবং বহুলোক আমার গত-রাত্রির কাহিনী শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। প্রশ্ন করিলাম, তাঁরা জানিলেন কিরূপে? বেহারা কহিল, তাঁবুর দারোয়ান জানাইয়াছে যে, আমি রাত্রিশেষে ফিরিয়া আসিয়াছি।

হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, বড়-তাঁবুতে প্রবেশ করিবামাত্রই সকলে হৈ-হৈ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। একসঙ্গে এক লক্ষ প্রশ্ন হইয়া গেল। দেখিলাম, কালকের সেই প্রবীণ ব্যক্তিটিও আছেন এবং একপাশে পিয়ারী তাহার দলবল লইয়া নীরবে বসিয়া আছে। প্রতিদিনের মত আজ আর তাহার সহিত চোখাচোখি হইল না। সে যেন ইচ্ছা করিয়াই আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল।

উচ্ছ্বসিত প্রশ্নতরঙ্গ শান্ত হইয়া আসিলে জবাব দিতে সুরু করিলাম। কুমারজী কহিলেন, ধন্য সাহস তোমার, শ্রীকান্ত! কত রাত্রে সেখানে পৌঁছুলে?

বারোটা থেকে একটার মধ্যে।

প্রবীণ ব্যক্তিটি কহিলেন, ঘোর অমাবস্যা। সাড়ে-এগারোটার পর অমাবস্যা পড়িয়াছিল।

চারিপাশ হইতেই বিস্ময়সূচক ধ্বনি উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ প্রশমিত হইলে, কুমারজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তারপর? কি দেখলে?

আমি বলিলাম, বিস্তর হাড়গোড় আর মড়ার মাথা।

কুমারজী বলিলেন, উঃ, কি ভয়ঙ্কর সাহস! শ্মশানের ভেতর ঢুকলে না বাইরে দাঁড়িয়েছিলে?

আমি বলিলাম, ভেতরে ঢুকে একটা বালির ঢিবিতে গিয়ে বসলুম।

তারপর, তারপর? ব'সে কি দেখলে?

ধূ ধূ করচে বালির চর।

আর?

কসাড়-ঝোপ আর শিমূলগাছ?

আর?

নদীর জল।

কুমারজী অধীর হইয়া কহিলেন, এ-সব ত জানি হে! বলি সে-সব কিছু—

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, আর গোটা-দুই বাদুড় মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছিলুম।

প্রবীণ ব্যক্তিটি তখন নিজে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আউর্ কুছ্ নেহি দেখা?

আমি কহিলাম, 'না।'

উত্তর শুনিয়া এক-তাঁবু লোক সকলেই যেন নিরাশ হইয়া পড়িল। প্রবীণ লোকটি তখন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এ্যাসা কভি হো নহি সক্‌তা। আপ্ গয়া নহি।

তাঁহার রাগ দেখিয়া আমি শুধু হাসিলাম। কারণ, রাগ হইবারই কথা। কুমারজী আমার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মিনতির স্বরে কহিলেন, তোমার দিব্যি শ্রীকান্ত, কি দেখলে, সত্যি বল।

সত্যি বলচি, কিছু দেখিনি।

কতক্ষণ ছিলে সেখানে?

ঘণ্টা তিনেক।

আচ্ছা, না দেখেচ, কিছু শুনতে পাওনি?

তা পেয়েচি।

একমুহূর্ত্তেই সকলের মুখ উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কি শুনিয়াছি, শুনিবার জন্য তাহারা আরও একটু ঘেঁসিয়া আসিল! আমি তখন বলিতে লাগিলাম কেমন করে পথের উপরেই একটা রাত্রিচর পাখী 'বাপ্' বলিয়া উড়িয়া গেল, কেমন করিয়া শিশুকণ্ঠে শকুনশিশু শিমুল-গাছের উপর গোঁয়াইয়া-গোঁয়াইয়া কাঁদিতে লাগিল; কেমন করিয়া হঠাৎ ঝড় উঠিল এবং মড়ার মাথাগুলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং সকলের শেষে কে যেন আমার পিছনে দাঁড়াইয়া অবিশ্রাম তুষারশীতল নিঃশ্বাস আমার ডান কানের উপর ফেলিতে লাগিল। আমার বলা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারো মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইল না। সমস্ত তাঁবুটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া ধীরে-ধীরে কহিলেন,—বাবুজী, আপনি যথার্থ ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়াই কাল প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আর কেহ হইলে পারিত না। কিন্তু আজ হইতে এই বুড়ার শপথ রহিল, বাবুজী, আর কখনও এরূপ দুঃসাহস করিবেন না। আপনার পিতামাতার চরণে আমার কোটী-কোটী প্রণাম—এ শুধু তাঁদেরই পুণ্যে আপনি বাঁচিয়াছেন।—বলিয়া তিনি ঝোঁকের মাথায় খপ্ করিয়া আমার পায়েতেই হাত দিয়া ফেলিলেন।

আগে বলিয়াছি, এই লোকটি কথা কহিতে জানে। এইবার সে কথা সুরু করিল। চোখের তারা, ভুরু, কখনো সঙ্কুচিত, কখনো প্রসারিত,

কখনো নির্ব্বাপিত, কখনো প্রজ্জ্বলিত করিয়া, সে, শকুনির কান্না হইতে আরম্ভ করিয়া কানের উপর নিঃশ্বাস ফেলার এম্‌নি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা জুড়িয়া দিল যে, দিনের বেলা এতগুলো লোকের মধ্যে বসিয়াও আমার পর্য্যন্ত মাথার চুল কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল! কাল সকালের মত আজও কখন যে পিয়ারী নিঃশব্দে ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ একটা নিঃশ্বাসের শব্দে ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, সে আমার ঠিক পিঠের কাছে বসিয়া নির্নিমেষ-চক্ষে বক্তার মুখের পানে চাহিয়া আছে এবং তাহার নিজের দুটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডের উপর ঝরা-অশ্রুর ধারাদুটি শুকাইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। কখন কি জন্য যে চোখের জল গড়াইয়াছিল, এ বোধ করি সে টের পায় নাই; পাইলে মুছিয়া ফেলিত। কিন্তু সেই অশ্রু-কলুষিত তদ্গত মুখখানি পলকের দৃষ্টিপাতেই আমার বুকের মধ্যে আগুনের রেখায় আঁকিয়া গেল। গল্প শেষ হইলেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কুমারজীকে একটা সেলাম করিয়া অনুমতি লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আজ সকালেই আমার বিদায় লইবার কথা ছিল। কিন্তু শরীরটা ভাল ছিল না বলিয়া, কুমারজীর অনুরোধ স্বীকার করিয়া ও-বেলায় যাওয়াই স্থির করিয়া নিজের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। এতদিনের মধ্যে আজ এই প্রথম পিয়ারীর আচরণে ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম। এতদিন সে পরিহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে, কলহের আভাস পর্য্যন্ত তাহার দুটি চোখের দৃষ্টিতে কতদিন ঘনাইয়া উঠিয়াছে, অনুভব করিয়াছি; কিন্তু এরূপ ঔদাসীন্য কখনও দেখি নাই। অথচ ব্যথার পরিবর্ত্তে খুসীই হইলাম। কেন তাহা জানি। যদিচ, যুবতী নারীর মনের গতিবিধি লইয়া মাথা-ঘামানো আমার পেশা নহে, ইতিপূর্ব্বে একাজ কোনদিন করিও নাই—কিন্তু আমার মনের মধ্যে বহু-জনমের যে অখণ্ড ধারাবাহিকতা লুকাইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় রমণী-হৃদয়ের নিগূঢ় তাৎপর্য্য ধরা পড়িয়া গেল। সে ইহাকে তাচ্ছিল্য মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল না, বরং প্রণয়-অভিমান জানিয়া পুলকিত হইল। বোধ করি ইহারই গোপন ইসারায় আমার

শ্মশান-অভিযানের এতখানি ইতিহাসের মধ্যে শুধু এই কথাটার উল্লেখ পর্য্যন্ত করিলাম না যে, পিয়ারী কাল রাত্রে আমাকে ফিরাইয়া আনিতে শ্মশানে লোক পাঠাইয়াছিল, এবং সে নিজেও গল্প-শেষে তেম্‌নি নীরবেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাই অভিমান! কাল রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া দেখা করিয়া বলি নাই, কি ঘটিয়াছিল। যে-কথা সকলের আগে একলা বসিয়া তাহার শুনিবার অধিকার ছিল, তাহাই আজ সে সকলের পিছনে বসিয়া যেন দৈবাৎ শুনিতে পাইয়াছে। কিন্তু, অভিমান যে এত মধুর, জীবনে এই স্বাদ আজ প্রথম উপলব্ধি করিয়া শিশুর মত তাহাকে নির্জ্জনে বসিয়া অবিরাম রাখিয়া-চাখিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম।

আজ দুপুরবেলাটা আমার ঘুমাইয়া পড়িবারই কথা; বিছানায় পড়িয়া মাঝে-মাঝে তন্দ্রাও আসিতে লাগিল; কিন্তু রতনের আসার আশাটা ক্রমাগত নাড়া দিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। এমনি করিয়া বেলা গড়াইয়া গেল, কিন্তু রতন আসিল না। সে যে আসিবেই, এ বিশ্বাস আমার মনে এত দৃঢ় ছিল যে, বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলাম, সূর্য্য অনেকখানি পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, তখন নিশ্চয় মনে হইল, আমার কোন এক তন্দ্রার ফাঁকে রতন ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া ফিরিয়া গেছে। মূর্খ! একবার ডাকিতে কি হইয়াছিল! দ্বিপ্রহরের নির্জ্জন অবসর নিরর্থক বহিয়া গেল মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম; কিন্তু সন্ধ্যার পরে সে যে আবার আসিবে—একটা কিছু অনুরোধ না হয় একছত্র লেখা—যা হোক একটা, গোপনে হাতে গুঁজিয়া দিয়া যাইবে, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। কিন্তু এই সময়টুকু কাটাই কি করিয়া? সুমুখে চাহিতেই খানিকটা দূরে অনেকখানি জল একসঙ্গে চোখের উপর ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। সে কোন একটা বিস্মৃত জমিদারের মস্ত কীর্ত্তি। দীঘিটা প্রায় আধক্রোশ দীর্ঘ! উপরদিকটা মজিয়া বুজিয়া গিয়াছে এবং তাহা ঘন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। গ্রামের বাহিরে বলিয়া গ্রামের মেয়েরা ইহার জল ব্যবহার করিতে পারিত না! কথায় কথায় শুনিয়াছিলাম, এই দীঘিটা যে কতদিনের

এবং কে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না! একটা পুরানো ভাঙ্গা ঘাট ছিল; তাহারই একান্তে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। একসময়ে ইহারই চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; কবে নাকি ওলাউঠায় ও মহামারীতে উজাড় হইয়া গিয়া বর্ত্তমান স্থানে সরিয়া আসিয়াছে। পরিত্যক্ত গৃহের বহু চিহ্ন চারিদিকে বিদ্যমান। অস্তগামী সূর্য্যের তির্য্যক রশ্মিটা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া দীঘির কালো জলে সোনা মাখাইয়া দিল, আমি চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

তারপর ক্রমশঃ সূর্য্য ডুবিয়া দীঘির কালো জল আরো কালো হইয়া উঠিল; অদূরে বন হইতে বাহির হইয়া দুই-একটা পিপাসার্ত্ত শৃগাল ভয়ে-ভয়ে জলপান করিয়া সরিয়া গেল। আমার যে উঠিবার সময় হইয়াছে,—যে সময়টুকু কাটাইতে আসিয়াছিলাম, তাহা কাটিয়া গিয়াছে—সমস্ত অনুভব করিয়াও উঠিতে পারিলাম না—এই ভাঙ্গা ঘাট যেন আমাকে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিল।

মনে হইল, এই যেখানে পা রাখিয়া বসিয়াছি, সেইখানে পা দিয়া কত লোক কতবার আসিয়াছে, গিয়াছে। এই ঘাটেই তাহারা স্নান করিত, গা ধুইত, কাপড় কাচিত, জল তুলিত। এখন তাহারা কোথায় কোন্ জলাশয়ে এইসমস্ত নিত্য-কর্ম্ম সমাধা করে? এই গ্রাম যখন জীবিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই তাহারা এম্‌নি সময়ে এখানে আসিয়া বসিত; কত গান, কত গল্প করিয়া সারাদিনের শ্রান্তি দূর করিত। তারপরে অকস্মাৎ একদিন যখন মহাকাল মহামারীরূপে দেখা দিয়া সমস্ত গ্রাম ছিঁড়িয়া লইয়া গেলেন, তখন কত মুমূর্ষু হয়ত তৃষ্ণায় ছুটিয়া আসিয়া এই ঘাটের উপরই শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। হয় ত তাহাদের তৃষ্ণার্ত্ত আত্মা আজিও এইখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহা চোখে দেখি না, তাহাই যে নাই, এমন কথাই বা কে জোর করিয়া বলিবে? আজ সকালেই সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি বলিয়াছিলেন, বাবুজী, মৃত্যুর পরে যে কিছুই থাকে না, অসহায় প্রেতাত্মারা যে আমাদের মতই সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা লইয়া বিচরণ করে না, তাহা কদাচ মনে করিও না। এই বলিয়া তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের গল্প, তালবেতাল-সিদ্ধির গল্প, আরও কত

তান্ত্রিক সাধু সন্ন্যাসীর কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন যে, সময় এবং সুযোগ হইলে তাহারা যে দেখা দিতে, কথা কহিতে পারে না বা করে না, তাহাও ভাবিও না; তোমাকে আর কখনো সে স্থানে যাইতে বলি না; কিন্তু, যাহারা এ-কাজ পারে, তাহাদের সমস্ত দুঃখ যে কোনদিন সার্থক হয় না, এ-কথা স্বপ্নেও অবিশ্বাস করিও না।

তখন সকালবেলার আলোর মধ্যে যে কথাগুলো শুধু নিরর্থক হাসির উপাদান আনিয়া দিয়াছিল, এখন সেই কথাগুলাই এই নির্জ্জন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আর একপ্রকারের চেহারা লইয়া দেখা দিল। মনে হইতে লাগিল জগতে প্রত্যক্ষ সত্য যদি কিছু থাকে ত সে মরণ। এই জীবনব্যাপী ভালমন্দ, সুখ-দুঃখের অবস্থাগুলা যেন আতসবাজী, বিচিত্র সাজ-সরঞ্জামের মত শুধু একটা কোন্ বিশেষ দিনে পুড়িয়া ছাই হইবার জন্যই এত যত্নে এত কৌশলে গড়িয়া উঠিতেছে। তবে মৃত্যুর পরপারের ইতিহাসটা যদি কোন উপায়ে শুনিয়া লইতে পারা যায়, তার চেয়ে লাভ আছে কি? তা সে যেই বলুক এবং যেমন করিয়াই বলুক না।

হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দে ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। ফিরিয়া দেখিলাম শুধু অন্ধকার—কেহ কোথাও নাই। একটা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গত রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া নিজের মনে হাসিয়া বলিলাম, না, আর বসে থাকা নয়। কাল ডান কানের উপর নিঃশ্বাস ফেলে গেছে, আজ এসে যদি বাঁ কানের উপর সুরু ক'রে দেয় ত সে বড় সোজা হবে না!

কতক্ষণ যে বসিয়া কাটাইয়াছি, এখন রাত্রি কত, ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। বোধ হয় যেন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। কিন্তু এ কি? চলিয়াছি ত চলিয়াছি—এই সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলা পথ যে আর শেষ হয় না! এতগুলা তাঁবুর একটা আলোও যে চোখে পড়ে না! অনেকক্ষণ হইতেই সম্মুখে একটা বাঁশঝাড় দৃষ্টিরোধ করিয়া বিরাজ করিতেছিল, হঠাৎ মনে হইল, কৈ এটা ত আসিবার সময় লক্ষ্য করি নাই! দিক্ ভুল করিয়া আর একদিকে চলি নাই ত? আরো খানিকটা অগ্রসর হইতেই টের পাইলাম, সেটা বাঁশঝাড় নয়, গোটাকয়েক তেঁতুলগাছ জড়াজড়ি করিয়া,

দিগন্ত আবৃত করিয়া, অন্ধকার জমাট বাধাইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; তাহারই নীচে দিয়া পথটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। জায়গাটা এমনি অন্ধকার যে, নিজের হাতটা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। বুকের ভিতরটা যেন গুর্‌গুর্ করিয়া উঠিল—এ যাইতেছি কোথায় ? চোখ-কান বুজিয়া কোনমতে তেঁতুলতলাটা পার হইয়া দেখি, সম্মুখে অনন্ত কালো আকাশ যতদূর দেখা যায় ততদূর বিস্তৃত হইয়া আছে। কিন্তু সুমুখে ওই উঁচু জায়গাটা কি ? নদীর ধারের সরকারী বাঁধ নয় ত ? বাধই ত বটে !

পা-দুটা যেন ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল, তবুও টানিয়া-টানিয়া কোনমতে তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই ! ঠিক নীচেই সেই মহাশ্মশান ! আবার কাহার পদশব্দ সুমুখ দিয়াই নীচে শ্মশানে গিয়া মিলাইয়া গেল ! এইবার টলিয়া-টলিয়া সেই ধুলা-বালুর উপরেই মূর্চ্ছিতের মত ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। আর আমার লেশমাত্র সংশয় রহিল না যে, কে আমাকে এক মহাশ্মশান হইতে আর এক মহাশ্মশানে পথ দেখাইয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেই যাহার পদশব্দ শুনিয়া ভাঙ্গা ঘাটের ওপর গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার পদশব্দ এতক্ষণ পরে ওই সম্মুখে মিলাইল।

দশ

সমস্ত ঘটনারই হেতু দেখাইবার জিদ্‌টা মানুষের যে বয়সে থাকে, সে বয়স আমার পার হইয়া গেছে। সুতরাং কেমন করিয়াই যে এই সূচীভেদ্য অন্ধকার নিশীথে একাকী পথ চিনিয়া দীঘির ভাঙ্গাঘাট হইতে এই শ্মশানের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং কাহারই বা সেই পদধ্বনি সেখানে আহ্বান-ইঙ্গিত করিয়া এইমাত্র সুমুখে মিলাইয়া গেল, এ-সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার মত বুদ্ধি আমার নাই—পাঠকের কাছে আমার দৈন্য স্বীকার করিতে এখন আর আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছি না। এ রহস্য আজও আমার কাছে তেমনি আঁধারে আবৃত

রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রেতযোনি স্বীকার করাও এ স্বীকারোক্তির প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য্য নয়। কারণ, নিজের চোখেই ত দেখিয়াছি—আমাদের গ্রামেই একটা বদ্ধ পাগল ছিল, সে দিনের বেলা বাড়ী বাড়ী ভাত চাহিয়া খাইত, আর রাত্রিতে একটা ছোট মইয়ের উপর কোঁচার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া, সেটা সুমুখে উঁচু করিয়া ধরিয়া ধারের বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। সে চেহারা দেখিয়া অন্ধকারে কত লোকের যে দাঁতকপাটী লাগিয়াছে, তাহার অবধি নাই। কোন স্বার্থ নাই, অথচ এই ছিল তাহার অন্ধকার রাত্রির কাণ্ড। নিরর্থক মানুষকে ভয় দেখাইবার আরও কত প্রকারের অদ্ভুত ফন্দী যে তাহার ছিল, তাহার সীমা নাই। শুকনো কাঠের আঁটি গাছের ডালে বাঁধিয়া তাহাতে আগুন দিত; মুখে কালিঝুলি মাখিয়া বিশালাক্ষ্মী দেবীর মন্দিরে বহু-ক্লেশে খড়া বহিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিত; গভীর রাত্রিতে ঘরের কানাচে বসিয়া খোনা-গলায় চাষাদের নাম ধরিয়া ডাকিত। অথচ, কেহ কোনদিন তাহাকে ধরিতে পারে নাই, এবং দিনের বেলায় তাহার চাল-চলন স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া ঘুণাগ্রেও তাহাকে সংশয় করিবার কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। আর এ শুধু আমাদের গ্রামেই নয়,—আট-দশখানা গ্রামের মধ্যেই সে এই কর্ম্ম করিয়া বেড়াইত। মরিবার সময় নিজের বজ্জাতি সে নিজে স্বীকার করিয়া যায় এবং ভূতের দৌরাত্ম্যও তখন হইতে শেষ হয়। এ ক্ষেত্রেও হয় ত তেমনি কিছু ছিল,—হয় ত ছিল না। কিন্তু যাক্‌গে।

বলিতেছিলাম যে, সেই ধূলাবালি ভরা বাঁধের উপর যখন হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলাম, তখনই শুধু দু'টি লঘু পদধ্বনি শ্মশানের অভ্যন্তরে গিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল। মনে হইল, সে যেন স্পষ্ট করিয়া জানাইল—ছি ছি, ও তুই কি করিলি? তোকে এতটা পথ যে পথ দেখাইয়া আনিলাম, সে কি ওইখানে বসিয়া পড়িবার জন্য? আয় আয়! একেবারে আমাদের ভিতরে চলিয়া আয়। এমন অশুচি, অস্পৃশ্যের মত প্রাঙ্গণের একান্তে বসিস্ না,—আমাদের সকলের মাঝখানে আসিয়া বোস্! কথাগুলা কাণে শুনিয়াছিলাম, কিম্বা হৃদয় হইতে অনুভব করিয়াছিলাম এ কথা আজ আর স্মরণ করিতে পারি না। কিন্তু, তবুও যে চেতনা রহিল, তাহার

কারণ—চৈতন্যকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে, সে এমনি একরকম করিয়া বজায় থাকে, একেবারে যায় না, এ আমি বেশ দেখিয়াছি। তাই দু'-চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সে যেন তন্দ্রার চাহনি। সে ঘুমানোও নয়, জাগাও নয়! তাহাতে নিদ্রিতের বিশ্রামও থাকে না, সজাগের উদ্যমও আসে না। ঐ একরকম!

তথাপি এ-কথাটা ভুলি নাই যে, অনেক রাত্রি হইয়াছে—আমাকে তাঁবুতে ফিরিতে হইবে, এবং সেজন্য একবার অন্ততঃ চেষ্টা করিতাম, কিন্তু মনে হইল সব বৃথা। এখানে আমি ইচ্ছা করিয়া আসি নাই—আসিব কল্পনাও করি নাই। সুতরাং যে আমাকে এই দুর্গম পথে পথ দেখাইয়া আনিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কাজ আছে। সে আমাকে শুধু-শুধু ফিরিতে দিবে না। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, নিজের ইচ্ছায় ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। যে পথে যেমন করিয়াই জোর করিয়া বাহির হও না কেন, সব পথই গোলক-ধাঁধার মত ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া সাবেক জায়গায় আনিয়া হাজির করে।

সুতরাং চঞ্চল হইয়া ছটফট্ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়া, কোন-প্রকার গতির চেষ্টামাত্র না করিয়া, যখন স্থির হইয়া বসিলাম, তখন অকস্মাৎ যে জিনিষটি চোখে পড়িয়া গেল, তাহার কথা আমি কোনদিনই বিস্মৃত হই নাই।

রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকেও পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্ব্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশ তলে পৃথিবীজোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত-চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর-মুখ বুজিয়া, নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এতবড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ-বাতাস, স্বর্গ-মর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত

করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ত ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসী-কৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার; সর্ব্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না,—যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার! মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন। তাই রাধার দু'চক্ষু ভরিয়া যে রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল, তাহাও ঘনশ্যাম। কখনও এ-সকল কথা ভাবি নাই, কোনদিন এ-পথে চলি নাই; তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশানপ্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে-ত কোনদিন জানি নাই! তবে হয় ত মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয় ত তার এমনি অফুরন্ত, সুন্দর রূপে আমার দু'চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে! আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে হে আমার কালো! হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি! হে আমার সর্ব্ব-দুঃখ-ভয়-ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই অন্ধতমসাবৃত নির্জ্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি। সহসা মনে হইল, তাই ত! তাঁহার এই নির্ব্বাক আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত হীন অন্তেবাসীর মত বাহিরে বসিয়া আছি কি জন্য? একেবারে ভিতরে মাঝখানে গিয়া বসি না কেন?

নামিয়া গিয়া ঠিক মধ্যস্থলে একেবারে চাপিয়া বসিয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ যে এখানে এইভাবে স্থির হইয়া ছিলাম, তখন হুঁস ছিল না। হুঁস হইতে দেখিলাম, তেমন অন্ধকার আর নাই—আকাশের একপ্রান্ত যেন স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারই অদূরে শুকতারা দপ্-দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। একটা চাপা কথাবার্ত্তার কোলাহল কাণে গেল। ঠাহর করিয়া দেখিলাম, দূরে শিমূল গাছের আড়ালে বাঁধের উপর দিয়া কাহারা যেন চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের দুই-চারিটা লণ্ঠনের আলোকও আশে-পাশে ইতস্ততঃ দুলিতেছে। পুনর্ব্বার বাঁধের উপর-উঠিয়া সেই আলোকেই দেখিলাম, দু'খানা গরুর গাড়ীর অগ্রপশ্চাৎ জনকয়েক লোক এইদিকেই অগ্রসর হইতেছে। বুঝিলাম, কাহারা এই পথে ষ্টেশনে যাইতেছে।

মাথায় সুবুদ্ধি আসিল যে, পথ ছাড়িয়া আমার দূরে সরিয়া যাওয়া আবশ্যক। কারণ, আগন্তুকের দল যত বুদ্ধিমান এবং সাহসীই হৌক, হঠাৎ এই অন্ধকার রাত্রিতে এরূপ স্থানে আমাকে একাকী ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, আর কিছু না করুক, একটা বিষম হৈ-হৈ রৈ-রৈ চীৎকার তুলিয়া দিবে, তাহাতে সংশয় নাই।

ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইলাম; এবং অনতিকাল পরেই ছই-দেওয়া দু'খানা গো-শকট পাঁচ-ছয়জনের প্রহরায় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার মনে হইল, ইহাদের অগ্রগামী লোক দুটা আমার দিকে চাহিয়াই ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া অতি মৃদুকণ্ঠে কি যেন বলাবলি করিয়াই পুনরায় অগ্রসর হইয়া গেল এবং অনতিকাল মধ্যেই সমস্ত দলবল বাঁধের ধারে একটা ঝাঁকড়া-গাছের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। রাত্রি আর বেশী বাকি নাই অনুভব করিয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমনি সময়ে সেই বৃক্ষান্তরাল হইতে সু-উচ্চ কণ্ঠের ডাক কাণে গেল, শ্রীকান্তবাবু—

সাড়া দিলাম, কে রে, রতন?

আজ্ঞে, হাঁ বাবু, আমি। একটু এগিয়ে আসুন।

দ্রুতপদে বাঁধের উপরে উঠিয়া ডাকিলাম, রতন, তোরা কি বাড়ী যাচ্ছিস?

রতন উত্তর দিল, হাঁ বাবু, বাড়ী যাচ্ছি · মা গাড়ীতে আছেন।

অদূরে উপস্থিত হইতেই, পিয়ারী পর্দ্দার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া কহি- এ যে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়, তা আমি দারোয়ানের কথা শুনেই বুঝে :পেরেচি, গাড়ীতে উঠে এসো, কথা আছে।

আমি সন্নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কথা ?

উঠে এসো, বলচি।

না, তা পারব না, সময় নেই। ভোরেব আগেই আমাকে তাঁবুে :পৌঁছতে হবে।

পিয়ারী হাত বাড়াইয়া খপ্ করিযা আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিং তীব্র জিদের স্বরে বলিল, চাকর-বাকবের সামনে আর ঢলাঢলি ক'রো ন —তোমার পায়ে পড়ি, একবার উঠে এসো—

তাহার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কতকটা যেন হতবুদ্ধি হইয়াই গাড়ী: উঠিয়া বসিলাম। পিয়ারী গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করিয়া দিয়া কহি- আজ আবাব এখানে তুমি কেন এলে ?

আমি সত্য কথাই কহিলাম। কহিলাম, জানি না।

পিয়ারী এখনও আমার হাত ছাড়ে নাই। বলিল, জান না ? আচ্ছা বেশ, কিন্তু লুকিয়ে এসেছিলে কেন ?

বলিলাম, এখানে আসার কথা কেউ জানে না বটে, কিন্তু লুকি আসিনি।

মিথ্যে কথা।

না।

তার মানে ?

মানে যদি খুলে বলি, বিশ্বাস করবে ? আমি লুকিয়েও আসিনি আসবার ইচ্ছেও ছিল না।

পিযারী বিদ্রূপের স্বরে কহিল, তা হ'লে তাঁবু থেকে তোমাকে উড়ি এনেচে—বোধ করি বলতে চাও ?

না, তা বলতে চাইনে। উড়িয়ে কেউ আনেনি ; নিজের পায়ে হেঁ এসেচি সত্যি। কিন্তু কেন এলুম, কখন এলুম, বলতে পারিনে।

পিয়ারী চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, রাজলক্ষ্মী, তুমি বিশ্বাস করতে পারবে কি না, জানিনে, কিন্তু বাস্তবিক ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য্য! এই বলিয়া আমি সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলাম।

শুনিতে শুনিতে আমার হাত-ধরা তাহার হাতখানা বারম্বার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে একটা কথাও কহিল না। পর্দ্দা তোলা ছিল, পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশ ফর্সা হইয়া গেছে। বলিলাম, এইবার আমি যাই।

পিয়ারী স্বপ্নাবিষ্টের মত কহিল, না।

না কি-রকম? এমনভাবে চ'লে যাবার অর্থ কি হবে জান?

জানি—সব জানি। কিন্তু এরা তো তোমার অভিভাবক নয় যে মানের দায়ে প্রাণ দিতে হবে? বলিয়াই সে আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া পা ধরিয়া ফেলিয়াই রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, কান্ত-দা, সেখানে ফিরে গেলে আর তুমি বাঁচবে না। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না, কিন্তু সেখানেও আর ফিরে যেতে দেবো না। তোমার টিকিট কিনে দিচ্ছি, তুমি বাড়ী চ'লে যাও—কিম্বা যেখানে খুসী যাও, কিন্তু ওখানে আর এক দণ্ডও না।

আমি বলিলাম, আমার কাপড়-চোপড় রয়েছে যে!

পিয়ারী কহিল, থাক্ প'ড়ে। তাদের ইচ্ছে হয় তোমাকে পাঠিয়ে দেবে; না হয় থাক্‌গে। তার দাম বেশী নয়।

আমি বলিলাম, তার দাম বেশী নয় সত্য, কিন্তু যে মিথ্যা কুৎসা-র ঘটনা হবে, তার দাম ত কম নয়।

পিয়ারী আমার পা ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাড়ী এইসময় মোড় ফিরিতেই পিছনটা আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। হঠাৎ মনে হইল, সম্মুখের ওই পূর্ব্ব-আকাশটার সঙ্গে এই পতিতার মুখের কি যেন একটা নিগূঢ় সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়ের মধ্য দিয়াই যেন একটা বিরাট অগ্নিপিণ্ড অন্ধকার ভেদ করিয়া আসিতেছে,—তাহারই আভাস দেখা দিয়াছে। কহিলাম, চুপ ক'রে রইলে যে?

পিয়ারী একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, কি জান কান্ত-দা, যে কলম দিয়ে সারাজীবন শুধু জাল-খৎ তৈরী করেছি, সেই কলমটা দিয়েই

আজ আর দানপত্র লিখতে হাত সরচে না। যাবে? আচ্ছা যাও! কিন্তু কথা দাও—আজ বেলা বারোটার আগেই বেরিয়ে পড়বে।

আচ্ছা।

কারো কোন অনুরোধেই আজ রাত্রি ওখানে কাটাবে না, বল।

না।

পিয়ারী হাতের আঙটি খুলিয়া আমার পায়ের উপর রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল এবং পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আঙটিটা আমার পকেটে ফেলিয়া দিল। বলিল, তবে যাও—বোধ করি, ক্রোশ-দেড়েক পথ তোমাকে বেশী হাঁটতে হবে।

গো-যান হইতে অবতরণ করিলাম। তখন প্রভাত হইয়াছিল। পিয়ারী অনুনয় করিয়া কহিল, আমার আর একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। বাড়ী ফিরে গিয়ে একখানি চিঠি দেবে।

আমি স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলাম। একটিবারও পিছনে চাহিয়া দেখিলাম না, তখনও তাহারা দাঁড়াইয়া আছে, কিম্বা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু বহুদূর পর্য্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলাম, দু'টি চক্ষের সজল-করুণ দৃষ্টি আমার পিঠের উপর বারম্বার আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।

আড্ডায় পৌঁছাইতে প্রায় আটটা বাজিয়া গেল। পথের ধারে পিয়ারীর ভাঙ্গা-তাঁবুর বিক্ষিপ্ত পরিত্যক্ত জিনিষগুলো চোখে পড়িবামাত্র একটা নিষ্ফল ক্ষোভ বুকের মধ্যে যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে তাঁবুর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম।

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বড় ভোরেই বেড়াতে বার হয়েছিলেন।

আমি হাঁ-না কোন কথাই না বলিয়া শয্যায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

এগার

পিয়ারীর কাছে যে সত্য করিয়াছিলাম, তাহা যে রক্ষাও করিয়াছিলাম, বাটী ফিরিয়া এই সংবাদ জানাইয়া তাহাকে চিঠি দিলাম। অবিলম্বে জবাব আসিল। আমি একটা বিষয় বরাবর লক্ষ্য করিয়াছিলাম—কোনদিন পিয়ারী আমাকে তাহার পাটনার বাটীতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি ত করেই নাই, সামান্য একটা মুখের নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত জানায় নাই। এই পত্রের মধ্যেও তাহার লেশমাত্র ইঙ্গিত ছিল না। শুধু নীচের দিকে নিবেদন ছিল, যাহা আমি আজিও ভুলি নাই। সুখের দিনে না হোক, দুঃখের দিনে তাহাকে বিস্মৃত না হই—এই প্রার্থনা।

দিন কাটিতে লাগিল। পিয়ারীর স্মৃতি ঝাপ্সা হইয়া প্রায় বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু এই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার মাঝে মাঝে আমার চোখে পড়িতে লাগিল—এবার শিকার হইতে ফিরিয়া পর্য্যন্ত আমার মন যেন কেমন বিমনা হইয়া গেছে; কেমন যেন একটা অভাবের বেদনা চাপা সর্দির মত দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে—বিছানায় শুইতে গেলেই তাহা খচ্ খচ্ করিয়া বাজে।

এটা মনে পড়ে, সেদিনটা হোলির রাত্রি। মাথা হইতে তখনও আবিরের গুঁড়া সাবান দিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলা হয় নাই। ক্লান্ত-বিবশ দেহে শয্যার উপর পড়িয়াছিলাম। পাশের জানালাটা খোলা ছিল; তাই দিয়া সুমুখের অশ্বত্থগাছের ফাঁক দিয়া আকাশভরা জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়াছিলাম। এতটাই মনে পড়ে। কিন্তু কেন যে দোর খুলিয়া সোজা ষ্টেশনে চলিয়া গেলাম এবং পাটনার টিকিট কিনিয়া ট্রেনে চড়িয়া বসিলাম, তাহা মনে পড়ে না। রাত্রিটা গেল। কিন্তু দিনের বেলা যখন শুনিলাম, সেটা 'বাড়' ষ্টেশন এবং পাটনার আর দেরী নাই—তখন হঠাৎ সেইখানেই নামিয়া পড়িলাম। পকেটে হাত দিয়া দেখি উদ্বেগের কিছুমাত্র হেতু নাই, দু'আনি আর পয়সাতে দশটা পয়সা তখনও আছে। খুসী হইয়া

দোকানের সন্ধানে ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেলাম। দোকান মিলিল। চুড়া, দহি এবং শর্করা-সংযোগে অত্যুৎকৃষ্ট ভোজন সম্পন্ন করিতে অর্দ্ধেক ব্যয় হইয়া গেল। তা যাক। জীবনে অমন কত যায়—সেজন্য ক্ষুণ্ণ হওয়া কাপুরুষতা।

গ্রামে পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। ঘণ্টাখানেক ঘুরিতে-না ঘুরিতে টের পাইলাম জায়গাটার দধি ও চুড়া যে পরিমাণে উপাদেয়, পানীয় জলটা সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট। আমার অমন ভূরিভোজন এইটুকু সময়ের মধ্যে এমনি পরিপাক করিয়া নষ্ট করিয়া দিল যে, মনে হইতে লাগিল, যেন দশ-বিশ দিন তণ্ডুল-কণাটিও মুখে যায় নাই। এরূপ কদর্য্য স্থানে বাস করা আর একদণ্ডও উচিত নয় মনে করিয়া স্থান-ত্যাগের কল্পনা করিতেছি, দেখি অদূরে একটা আমবাগানের ভিতর হইতে ধূম্র দেখা দিয়াছে।

আমার ন্যায়-শাস্ত্র জানা ছিল। ধূম্র দেখিয়া অগ্নি নিশ্চয়ই অনুমান করিলাম ; বরঞ্চ অগ্নির হেতু অনুমান করিতে আমার বিলম্ব হইল না। সুতরাং সোজা সেইদিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জলটা এখানকার বড় বদ।

বাঃ এই ত চাই! এ যে খাঁটি সন্ন্যাসীর আশ্রম! মস্ত ধুনির উপর লোটায় করিয়া চায়ের জল চড়িয়াছে। 'বাবা' অর্দ্ধমুদ্রিত-চক্ষে সম্মুখে বসিয়া আছেন ; তাঁহার আশে-পাশে গাঁজার উপকরণ। একজন বাচ্চা-সন্ন্যাসী একটা ছাগী দোহন করিতেছে—চা-সেবায় লাগিবে। গোটা দুই উট, গোটা দুই টাট্টু ঘোড়া এবং সবৎসা গাভী কাছাকাছি গাছের ডালে বাঁধা রহিয়াছে। পাশেই একটা ছোট তাঁবু। উঁকি মারিয়া দেখি, ভিতরে আমার বয়সী এক চেলা দুই পায়ে পাথরের বাটী ধরিয়া মস্ত একটা নিমদণ্ড দিয়া ভাঙ্ তৈয়ারী করিতেছে। দেখিয়া আমি ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া গেলাম, এবং চক্ষের পলকে সাধু-বাবাজীর পদতলে একেবারে লুটাইয়া পড়িলাম। পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া করযোড়ে মনে মনে বলিলাম, ভগবান তোমার কি অসীম করুণা! কি স্থানেই আমাকে আনিয়া দিলে! চুলোয় যাক্‌গে পিয়ারী,—এই মুক্তিমার্গের সিংহদ্বার

ছাড়িয়া তিলার্দ্ধ যদি অন্যত্র যাই, আমার যেন অনন্ত নরকেও আর স্থান না হয়।

সাধুজী বলিলেন, কেঁও বেটা ?

আমি সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, আমি গৃহত্যাগী মুক্তিপথান্বেষী হতভাগ্য শিশু ; আমাকে দয়া করিয়া তোমার চরণসেবার অধিকার দাও।

সাধুজী মৃদু হাস্য করিয়া বার-দুই মাথা নাড়িয়া হিন্দী করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, বেটা, ঘরে ফিরিয়া যাও---এ পথ অতি দুর্গম।

আমি করুণকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিলাম, বাবা, মহাভারতে লেখা আছে, মহাপাপিষ্ঠ জগাই-মাধাই বশিষ্ঠ মুনির পা ধরিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন ; আর আপনার পা ধরিয়া আমি কি মুক্তিও পাইব না ? নিশ্চয়ই পাইব।

সাধুজী খুসী হইয়া বলিলেন, বাত্ তেরা সাচ্চা হ্যায়। আচ্ছা বেটা, রামজীকা খুসী। যিনি দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া চা তৈরী করিয়া 'বাবা'কে দিলেন। তাঁহার সেবা হইয়া গেলে আমরা প্রসাদ পাইলাম।

ভাঙ্ তৈয়ারী হইতেছিল সন্ধ্যার জন্য। তখনও বেলা ছিল, সুতরাং অন্যপ্রকার আনন্দের উদ্যোগ করিতে 'বাবা' তাঁর দ্বিতীয় চেলাকে গঞ্জিকার কলিকাটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন এবং প্রস্তুত হইতে বিলম্ব না হয় সে-বিষয়ে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিলেন।

আধ-ঘন্টা কাটিয়া গেল ! সর্ব্বদর্শী 'বাবা' আমার প্রতি পরম তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'হাঁ বেটা, তোমার অনেক গুণ ; তুমি আমার চেলা হইবার অতি উপযুক্ত পাত্র।'

আমি পরমানন্দে আর একবার 'বাবা'র পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, গুরুজীর আশীর্ব্বাদে অভাব কিছুরই নাই। প্রধান চেলা যিনি, তিনি টাটকা এক-সুট গেরুয়া বস্ত্র, জোড়া দশেক ছোট-বড় রুদ্রাক্ষমালা এবং একজোড়া পিতলের তাগা বাহির করিয়া দিলেন ; যেখানে যেটি মানায়—সাজগোজ করিয়া,

খানিকটা ধুনির ছাই, মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিলাম। চোখ টিপিয়া কহিলাম, বাবাজী, বলি আয়না-টায়না হ্যায়? মুখখানা যে ভারি একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

দেখিলাম, তাঁহারও রসবোধ আছে। তথাপি একটু গম্ভীর হইয়া তাচ্ছিল্যভবেই বলিলেন. হ্যায় একঠো।

তবে লুকিয়ে আনো না একবার।

মিনিট-দুই পরে আয়না লইয়া একটা গাছের আড়ালে গেলাম। পশ্চিমী নাপিতেরা যেরূপ একখানি আয়না হাতে ধরাইয়া দিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পন্ন করে, সেইরূপ ছোট একটুখানি টিনমোড়া আরসি। তা হোক, একটুখানি দেখিলাম, যত্নে এবং সদা-ব্যবহারে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চেহারা দেখিয়া আর হাসিয়া বাচি না। কে বলিবে—আমি সেই শ্রীকান্ত, যিনি কিছুকাল পূর্ব্বেও রাজা-বাজড়াব মজলিসে বসিয়া বাইজীর গান শুনিতেছিলেন! তা যাক্।

ঘণ্টাখানেক পরে গুরু-মহারাজের সমীপে দীক্ষার জন্য নীত হইলাম। মহারাজ চেহারা দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, বেটা, মহিনা এক-আধ ঠহ্‌রো।

মনে মনে 'বহুত্‌ আচ্ছা' বলিয়া তাঁর পদধূলি গ্রহণ করিয়া যুক্তকরে ভক্তিভরে একপাশে বসিলাম।

আজ কথায়-কথায় তিনি আধ্যাত্মিকতার অনেক উপদেশ দিলেন। ইহার দুরূহতার বিষয়, ইহার গভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার বিষয় আজকাল ভণ্ড পাষণ্ডেরা কি প্রকারে কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার বিশেষ বিবরণ এবং ভগবৎপাদপদ্মে মতি স্থির করিতে হইলেই বা কি কি আবশ্যক, এতৎপক্ষে বৃক্ষজাতীয় শুষ্ক বস্তুবিশেষের ধূম ঘন-ঘন মুখবিবর দ্বারা শোষণ করতঃ নাসারন্ধ্র পথে শনৈঃ শনৈঃ বিনির্গত করায় কিরূপ আশ্চর্য্য উপকার তাহা বুঝাইয়া দিলেন, এবং এ-বিষয়ে আমার নিজের অবস্থা যে অত্যন্ত আশাপ্রদ, সেই ইঙ্গিত করিয়াও আমার উৎসাহবর্দ্ধন করিলেন। এইরূপে সেদিন মোক্ষপথের অনেক নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হইয়া গুরু-মহারাজের তৃতীয় চেলাগিরিতে বহাল হইয়া গেলাম।

গভীর বিরাগ ও কঠোর সাধনার জন্ম মহারাজের আদেশে আমাদের সেবার ব্যবস্থাটা অম্‌নি একটু কঠোর রকমের ছিল। তাহার পরিমাণও যেমনি, রসনাতেও তাহা তেম্‌নি! চা, রুটি, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, চুড়া, শর্করা ইত্যাদি কঠোর সাত্ত্বিক ভোজন এবং তাহা জীর্ণ করিবার অনুপান। আবার ভগবৎপদারবিন্দ হইতেও চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, সেদিকেও আমাদের লেশমাত্র অবহেলা ছিল না। ফলে, আমার শুক্‌নো কাঠে ফুল ধরিয়া গেল—একটুখানি ভুঁড়ির লক্ষণও দেখা ছিল।

একটা কাজ ছিল—ভিক্ষায় বাহির হওয়া। সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা সর্ব্বপ্রধান কাজ না হইলেও, একটা প্রধান কাজ বটে। কারণ সাত্ত্বিক ভোজনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মহারাজ নিজে ইহা করিতেন না, আমরা তাঁহার সেবকেরা পালা করিয়া করিতাম। সন্ন্যাসীর অপরাপর কর্ত্তব্যে আমি তাঁহার অন্য দুই চেলাকে অতি সত্বর ডিঙ্গাইয়া গেলাম; শুধু এইটাতেই বরাবর খোঁড়াইতে লাগিলাম। এটা কোনদিনই নিজের কাছে সহজ এবং রুচিকর করিয়া তুলিতে পারিলাম না। তবে এই একটা সুবিধা ছিল—সেটা হিন্দুস্থানীদের দেশ। আমি ভাল-মন্দর কথা বলিতেছি না; আমি বলিতেছি, বাংলাদেশের মত সেখানকার মেয়েরা 'হাতজোড়া—আর এক বাড়ী এগিয়ে দেখ' বলিয়া উপদেশ দিত না, এবং পুরুষেরাও চাকরী না করিয়া ভিক্ষা করি কেন, তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিত না। ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে প্রতি গৃহস্থই সেখানে ভিক্ষা দিত—কেহই বিমুখ করিত না।

এম্‌নি দিন যায়। দিন-পনের ত সেই আম-বাগানের মধ্যেই কাটিয়া গেল। দিনেরবেলা কোন বালাই নাই, শুধু রাত্রে মশার কামড়ের জ্বালায় মনে হইত—থাক্‌ মোক্ষসাধন! গায়ের চামড়া আর একটু মোটা করিতে না পারিলে ত আর বাঁচি না। অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালী যত সেরাই হোক, এ-বিষয়ে বাঙ্গালীর চেয়ে হিন্দুস্থানী চামড়া যে সন্ন্যাসের পক্ষে ঢের বেশী অনুকূল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সেদিন প্রাতঃস্নান করিয়া সাত্ত্বিক ভোজনের চেষ্টায় বহির্গত হইতেছি, গুরু মহারাজ ডাকিয়া বলিলেন

"ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা

যিনহি রামপদ অতি অনুরাগা—"

(অর্থাৎ ষ্ট্রাইক্ দি টেণ্ট)—প্রয়াগ যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু কাজ ত সহজ নয়। সন্ন্যাসীর যাত্রা কিনা! পা-বাঁধা টাট্টু খুঁজিয়া আনিয়া বোঝাই দিতে, উটের উপর মহারাজের জিন কসিয়া দিতে, গরু-ছাগল সঙ্গে লইতে, পোঁটলা-পাঁটলি বাঁধিতে গুছাইতে একবেলা গেল। তারপরে রওনা হইয়া ক্রোশ-দুই দূরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিঠৌরা গ্রামপ্রান্তে এক বিরাট বটমূলে আস্তানা ফেলা হইল। জায়গাটি মনোরম, গুরু-মহারাজের দিব্য পছন্দ হইল। তা ত' হইল, কিন্তু সেই ভরদ্বাজ মুনির আস্তানায় পৌঁছিতে যে কয় মাস লাগিবে, সে ত' অনুমান করিতেই পারিলাম না।

এই বিঠৌরা গ্রামের নামটা কেন আমার মনে আছে, তাহা এইখানে বলিব। সেদিনটা পূর্ণিমা তিথি। অতএব গুরু-আদেশে আমরা তিন-জনেই তিন দিকে ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। একা হইলে উদরপূর্ত্তির জন্য চেষ্টা-চরিত্র মন্দ করিতাম না। কিন্তু আজ আমার সে চাড় ছিল না বলিয়া অনেকটা নিরর্থক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। একটা বাড়ীর খোলা দরজার ভিতর দিয়া হঠাৎ একটি বাঙ্গালী মেয়ের চেহারা চোখে পড়িয়া গেল। তার কাপড়খানা যদিচ দেশী তাঁতে বোনা গুনচটের মতই ছিল, কিন্তু পরিবার বিশেষ ভঙ্গীটাই আমার কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল। ভাবিলাম, পাঁচ-ছয়দিন এই গ্রামে আছি, প্রায় সব ঘরেই গিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ে ত' দূরের কথা—একটা পুরুষের চেহারাও ত' চোখে পড়ে নাই। সাধু-সন্ন্যাসীর অবারিত দ্বার। ভিতরে প্রবেশ করিতেই মেয়েটি আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখখানি আমি আজও মনে করিতে পারি। তাহার কারণ এই যে, দশ-এগারো বছরের মেয়ের চোখে এমন করুণ, এমন মলিন-উদাস চাহনি আমি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহার মুখে, তাহার ঠোঁটে, তাহার চোখে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দুঃখ এবং হতাশা যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। আমি একেবারেই বাংলা করিয়া বলিলাম, চাট্টি ভিক্ষে

আনো দেখি মা। প্রথমটা সে কিছুই বলিল না। তারপর তার ঠোঁট দু'টি বার দুই কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল; তারপরে সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি মনে-মনে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। কারণ, সম্মুখে কেহ না থাকিলেও, পাশের ঘর হইতে বেহারী মেয়েদের কথাবার্ত্তা শুনা যাইতেছিল। তাহাদের কেহ হঠাৎ বাহির হইয়া এ-অবস্থায় উভয়কে দেখিয়া কি ভাবিবে, কি বলিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া—দাঁড়াইব, কি প্রস্থান করিব, স্থির করিবার পূর্ব্বেই—মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে একনিঃশ্বাসে সহস্র প্রশ্ন করিয়া ফেলিল,—তুমি কোথা থেকে আসচ? তুমি কোথায় থাক? তোমার বাড়ী কি বর্দ্ধমান জেলায়? কবে সেখানে যাবে? তুমি রাজপুর জানো? সেখানকার গৌরী তেওয়ারীকে চেনো?

আমি কহিলাম, তোমার বাড়ী কি বর্দ্ধমানের রাজপুরে?

মেয়েটি হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল, হ্যাঁ। আমার বাবার নাম গৌরী তেওয়ারী, আমার দাদার নাম রামলাল তেওয়ারী। তাঁদের তুমি চেনো? আমি তিনমাস শ্বশুরবাড়ী এসেচি—একখানি চিঠিও পাইনে। বাবা, দাদা, মা, গিরিবালা, খোকা কেমন আছে, কিচ্ছু জানিনে। ঐ যে অশ্বত্থ গাছ—ওর তলায় আমার দিদির শ্বশুরবাড়ী। ও-সোমবারে দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে—এরা বলে, না,—সে কলেরায় মরেচে।

আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম; ব্যাপার কি? এরা ত দেখচি পুরা হিন্দুস্থানী, অথচ মেয়েটি একেবারে খাঁটি বাঙ্গালীর মেয়ে। এতদূরে এ-বাড়ীতে এদের শ্বশুরবাড়ীটিই বা কি করিয়া হইল, আর ইহাদের স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ীই বা এখানে কি করিতে আসিল?

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার দিদি গলায় দড়ি দিলে কেন?

সে কহিল, দিদি রাজপুরে যাবার জন্য দিনরাত কাঁদত—খেতো না, শুতো না। তাই তার চুল আড়ায় বেঁধে তাকে সারা দিনরাত দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তাই দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে।

প্রশ্ন করিলাম, তোমারও শ্বশুর-শাশুড়ী কি হিন্দুস্থানী?

মেয়েটি আর একবার কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, হ্যাঁ। আমি তাদের কথা কিছু বুঝতে পারিনে, তাদের রান্না মুখে দিতে পারিনে--আমি ত দিন-রাত কাঁদি। কিন্তু বাবা আমাকে চিঠিও লেখে না, নিয়েও যায় না।

জিজ্ঞেসা করিলাম, আচ্ছা, তোমার বাবা এতদূরে তোমার বিয়ে দিলেন কেন?

মেয়েটি কহিল, আমরা যে তেওয়ারী। আমাদের বর ও-দেশে ত পাওয়া যায় না।

তোমাকে কি এরা মারধর করে?

করে না? এই দেখ না, বলিয়া মেয়েটি বাহুতে, পিঠের উপর, গালের উপর দাগ দেখাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আমিও দিদির মত গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব!

তাহার কান্না দেখিয়া আমার নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। আর প্রশ্নোত্তর বা ভিক্ষার অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। মেয়েটি কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিয়া বলিতে লাগিল, আমার বাবাকে গিয়ে তুমি বলবে ত? আমাকে একবার নিয়ে যেতে—নইলে আমি---। আমি কোনমতে একটা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলাম। মেয়েটির বুক-চেরা আবেদন আমার দুই কানের মধ্যে বাজিতেই লাগিল।

রাস্তার মোড়ের উপরেই একটা মুদীর দোকান। প্রবেশ করিতেই দোকানদার সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল। খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা না করিয়া যখন একখানা চিঠির কাগজ ও কালি-কলম চাহিয়া বসিলাম, তখন সে কিছু আশ্চর্য্য হইল বটে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিল না। সেইখানে বসিয়া গৌরী তেওয়ারীর নামে একখানি পত্র লিখিয়া ফেলিলাম। সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া পরিশেষে এ-কথাও লিখিতে ছাড়িলাম না যে, মেয়েটির দিদি সম্প্রতি গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে এবং সেও মারধর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সেই পথে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। তুমি নিজে আসিয়া ইহার বিহিত না করিলে কি ঘটে, বলা যায় না। খুব সম্ভব তোমার চিঠিপত্র ইহারা মেয়েটিকে দেয় না। ঠিকানা দিলাম, বর্দ্ধমান

জেলার রাজপুর গ্রাম। জানি না, সে-পত্র গৌরী তেওয়ারীর কাছে পৌঁছিয়াছিল কিনা, এবং পৌঁছাইলে সে কিছু করিয়াছিল কি না। কিন্তু ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে এমনি মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, এতকাল পরেও সমস্ত স্মরণে রহিয়াছে, এবং এই আদর্শ হিন্দুসমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব আজিও যায় নাই।

হইতে পারে, এই জাতিভেদ ব্যাপারটা খুব ভাল। এই উপায়েই সনাতন হিন্দু-জাতিটা যখন আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তখন ইহার প্রচণ্ড উপকারিতা সম্বন্ধে সংশয় করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছুই নাই। কে কোথায় দু'টো হতভাগ্য মেয়ে দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিবে বলিয়া ইহার কঠোর বন্ধন একবিন্দু শিথিল করার কল্পনা করাও পাগলামি। কিন্তু মেয়েটার কান্না যে-লোক চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, তাঁহার সাধ্য নাই, এ প্রশ্ন নিজের নিকট হইতে থামাইয়া রাখে যে—কোনমতে টিকিয়া থাকাই কি চরম সার্থকতা? এমন অনেক জাতিই ত টিকিয়া আছে। কুকিরা আছে, কোল ভীল-সাঁওতালরা আছে, প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক ছোট-খাটো দ্বীপের অনেক ছোট-খাটো জাতিরা মানুষ-সৃষ্টির সুরু হইতেই বাঁচিয়া আছে, আফ্রিকায় আছে, আমেরিকায় আছে; তাদেরও এমন সকল কড়া সামাজিক আইন-কানুন আছে যে, শুনিলে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়! বয়সের হিসাবে তাহারা য়ুরোপের অনেক জাতির অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের চেয়েও প্রাচীন—আমাদের চেয়েও পুরাতন। কিন্তু তাই বলিয়াই যে, ইহারা আমাদের চেয়ে সামাজিক আচার-ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ, এমন অদ্ভুত সংশয়, বোধ করি কাহারো মনে উঠে না। সামাজিক সমস্যা ঝাঁক বাঁধিয়া দেখা দেয় না। এমনি এক-আধটা ক্বচিৎ কদাচিৎ আবির্ভূত হয়। নিজের বাঙ্গালী মেয়ে দু'টির খোট্টার ঘরে বিবাহ দিবার সময় গৌরী তেওয়ারীর মনে বোধ করি এরূপ প্রশ্ন আসিয়াছিল। কিন্তু সে-বেচারা এই দুরূহ প্রশ্নের কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়াই, শেষে সামাজিক যূপকাষ্ঠে কন্যা দুটিকে বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। যে সমাজ এই দু'টি নিরুপায় ক্ষুদ্র বালিকার জন্যও স্থান করিয়া দিতে পারে

নাই, যে সমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করিবার শক্তি রাখে না, সেই পঙ্গু আড়ষ্ট সমাজের জন্য মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে পারিলাম না। কোথায় একজন মস্ত বড়লোকের লেখায় পড়িয়াছিলাম, আমাদের সমাজ 'জাতিভেদ' বলিয়া যে একটা বড়রকম সামাজিক প্রশ্নের উত্তর জগতের সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছিল, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজিও হয় নাই—এইরকম একটা কথা। কিন্তু এই সমস্ত যুক্তিহীন উচ্ছ্বাসের উত্তর দিতেও যেমন প্রবৃত্তি হয় না—'হয় নাই', 'হবে না' বলিয়া নিজের প্রশ্নের নিজেরই উত্তর প্রবলকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিয়া যাহারা চাপিয়া বসিয়া যায়, তাহাদের জবাব দেওয়াও তেমনি কঠিন। যাক্ গে।

দোকান হইতে উঠিলাম। সন্ধান করিয়া বেয়ারিং পত্রটা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া, যখন আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখনও আমার অন্যান্য সহযোগীরা আটা, চাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসে নাই।

দেখিলাম, সাধুবাবা আজ যেন কিছু বিরক্ত। হেতুটা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, এ-গ্রামটা সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তেমন অনুরক্ত নয়, সেবাদির ব্যবস্থা তেমন সন্তোষজনক হবে না; সুতরাং কালই এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। যে আজ্ঞা, বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলাম। পাটনাটা দেখিবার জন্য মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রবল কৌতূহল ছিল, নিজের কাছে আজ আর তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারিলাম না।

তা ছাড়া, এইসকল বেহারী পল্লীগুলাতে কোনরকম আকর্ষণই খুঁজিয়া পাই না। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলার অনেক গ্রামেই ত বিচরণ করিয়া ফিরিয়াছি, কিন্তু তাহাদের সহিত ইহাদের কোন তুলনাই হয় না। নরনারী, গাছপালা জলবায়ু কোনটাকেই আপন বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত মনটা সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত শুধু কেবল পালাই-পালাই করিতে থাকে।

সন্ধ্যাবেলায় পাড়ায় পাড়ায় তেমন করিয়া খোল-করতালের সঙ্গে কীর্ত্তনের সুর কানে আসে না। দেব-মন্দিরে আরতির কাঁসর-ঘণ্টাগুলোও সেরূপ গম্ভীর মধুর শব্দ করে না। এ-দেশের মেয়েরা শাঁখগুলাও কি ছাই

.তমনি মিষ্ট করিয়া বাজাইতে জানে না? এখানে মানুষ কি সুখেই থাকে! আর মনে হইতে লাগিল, এইসব পাড়াগাঁয়ের মধ্যে না আসিয়া পড়িলে ত নিজেদের পাড়াগাঁয়ের মূল্য কোনদিনই এমন করিয়া চোখে পড়িত না। আমাদের জলে পানা, হাওয়ায় ম্যালেরিয়া, মানুষের পেটে-পেটে পিলে, ঘরে-ঘরে মামলা, পাড়ায়-পাড়ায় দলাদলি ;—তা হোক, তবু তারই মধ্যে যে কত রস, কত তৃপ্তি ছিল, এখন যেন তাহার কিছুই না বুঝিয়াই সমস্ত বুঝিতে লাগিলাম।

পরদিন তাঁবু ভাঙ্গিয়া যাত্রা করা হইল ; এবং সাধুবাবা যথাশক্তি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের দিকে সদলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু পথটা সোজা হইবে বলিয়াই হৌক, কিম্বা মুনি আমার মন বুঝিয়াই হৌক, পাটনার দশ ক্রোশের মধ্যে আর তাঁবু গাড়িলেন না। মনে একটা বাসনা ছিল। তা' সে এখন থাক্। পাপতাপ অনেক করিয়াছি—সাধুসঙ্গে দিন-কতক পবিত্র হইয়া আসি গে।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে যে জায়গায় আমাদের আড্ডা পড়িল, তাহার াম ছোট-বাঘিয়া। আরা ষ্টেশন হইতে ক্রোশ আষ্টেক দূরে। এই গ্রামে কটি মহাপ্রাণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার দাশয়তার এইখানে একটু বিবরণ দিব। তাঁহার পৈতৃক নামটা গোপন রিয়া রামবাবু বলাই ভাল। কারণ এখনও তিনি জীবিত আছেন, এবং পরে ন্যত্র যদিচ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল, তিনি আমাকে চিনিতে রেন নাই। না পারা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাব জানি,—াপনে তিনি যে সকল সৎকার্য্য করিয়াছেন, তাহার প্রকাশ্যে উল্লেখ রিলে, তিনি বিনয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবেন, তাহা নিশ্চিত বুঝিতেছি। তএব তাঁর নাম রামবাবু! কি সূত্রে যে রামবাবু এই গ্রামে আসিয়া-লেন এবং কেমন করিয়া যে জমি-জমা সংগ্রহ করিয়া চাষ-আবাদ রিতেছিলেন, অত কথা জানি না। এইমাত্র জানি, তিনি দ্বিতীয় পক্ষ গুটি তিন-চার পুত্র-কন্যা লইয়া তখন সুখে বাস করিতেছিলেন।

সকালবেলা শোনা গেল, ছোটাবড়া বাঘিয়া ত বটেই, আরও পাঁচ সাতখানি গ্রামের মধ্যে তখন বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে গ্রামের এইসকল দুঃসময়ের মধ্যেই সাধুসন্ন্যাসীর সেবা বেশ সন্তোষজনক হয়। সুতরাং সাধুবাবা অবিচলিত-চিত্তে তথায় অবস্থান করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

ভাল কথা। সন্ন্যাসী-জীবটার সম্বন্ধে এইখানে আমি একটা কথা বলিতে চাই। জীবনে ইঁহাদের অনেকগুলিকেই দেখিয়াছি। বার চারেক এইরূপ ঘনিষ্ঠভাবেও মিশিয়াছি। দোষ যাহা আছে, সে ত আছেই। আমি গুণের কথা বলিব। নিছক 'পেটের দায়ে সাধুজী', আপনারা ত অনেকেই জানেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যেও এই দুটা দোষ আমার চোখে পড়ে নাই। আর চোখের দৃষ্টিটাও যে আমার খুব মোটা তাও নয়। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ইহাদের সংযমই বলুন, আর উৎসাহের স্বল্পতাই বলুন,—খুব বেশী, এবং প্রাণের ভয়টা ইঁহাদের নিতান্তই কম—'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ' ত আছেই ; কিন্তু কি করিলে অনেকদিন জীবেৎ, এ খেয়াল নাই। আমাদের সাধুবাবারও এ-ক্ষেত্রে তাহাই হইল। প্রথমটার জন্য দ্বিতীয়টা তিনি তুচ্ছ করিয়া দিলেন।

একটুখানি ধুনির ছাই এবং দু'ফোঁটা কমণ্ডলুর জলের পবিবর্ত্তে যেসকল বস্তু হু হু করিয়া ঘরে আসিতে লাগিল, তাহা সন্ন্যাসী, গৃহী কাহারও বিরক্তিকর হইতে পারে না।

রামবাবু সস্ত্রীক কাঁদিয়া আসিয়া পড়িলেন। চারদিন জ্বরের পর আজ সকালে বড় ছেলেটির বসন্ত দেখা দিয়াছে এবং ছোট ছেলেটি কাল রাত্রি হইতেই জ্বরে অচৈতন্য। বাঙ্গালী দেখিয়া আমি উপযাচক হইয়া রামবাবুর সহিত পরিচয় করিলাম।

ইহার পরের গল্পের মধ্যে মাসখানেকের বিচ্ছেদ দিতে চাই। কারণ, কেমন করিয়া এ পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল, কেমন করিয়া ছেলে দু'টি ভাল হইল—সে অনেক কথা। বলিতে আমার নিজেরই ধৈর্য্য থাকিবে না, তা পাঠকের ত ঢের দূরের কথা। তবে, মাঝে একটা কথা বলিয়া রাখি। দিন পনের পরে, রোগের যখন বড় বাড়াবাড়ি, তখন সাধুজী তাঁহার আস্তানা

গুটাইবার প্রস্তাব করিলেন। রামবাবুর স্ত্রী কাঁদিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসী-দাদা তুমি ত সত্যিই সন্ন্যাসী নও—তোমার শরীরে দয়া-মায়া আছে। আমার নবীন জীবনকে তুমি ফেলে চ'লে গেলে, তারা কখ্খনো বাঁচবে না। কই, যাও দেখি, কেমন ক'রে যাবে ? বলিয়া তিনি আমার পা ধরিয়া ফেলিলেন। আমার চোখেও জল আসিল, রামবাবুও স্ত্রীর প্রার্থনায় যোগ দিয়া কাকুতিমিনতি করিতে লাগিলেন। সুতরাং আমি যাইতে পারিলাম না। সাধুবাবাকে বলিলাম, প্রভু, তোমরা অগ্রসর হও, আমি পথের মধ্যে না পারি, প্রয়াগে গিয়া যে তোমার পদধূলি মাথায় লইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রভু ক্ষুন্ন হইলেন। শেষে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া নিরর্থক কোথাও বিলম্ব না করি, সে বিষয়ে বারম্বার সতর্ক করিয়া দিয়া, সদলবলে যাত্রা করিলেন। আমি রামবাবুর বাটীতেই রহিয়া গেলাম। এই অল্পদিনের মধ্যেই আমি যে প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্র হইয়াছিলাম, এবং টিকিয়া থাকিলে তাঁহার সন্ন্যাসীলীলার অবসানে উত্তরাধিকার-সূত্রে টাট্টু এবং উট দু'টো যে দখল করিতে পারিতাম, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যাক, —হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া, গত কথা লইয়া পরিতাপ করিয়া লাভ নাই।

ছেলে দু'টি সারিয়া উঠিল। মারী এইবার প্রকৃতই মহামারীরূপে দেখা দিলেন। এ যে কি ব্যাপার, তাহা যে না চোখে দেখিয়াছে, তাহার দ্বারা—লেখা পড়িয়া, গল্প শুনিয়া বা কল্পনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। অতএব এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস আমি করিব না। লোক পলাইতে আরম্ভ করিল—ইহার আর কোন বাচ-বিচার রহিল না। যে-বাড়ীতে মানুষের চিহ্ন দেখা গেল, সেখানে উঁকি মারিয়া দেখিলেই চোখে পড়িতে পারিত—শুধু মা তাঁর পীড়িত সন্তানকে আগলাইয়া বসিয়া আছেন।

রামবাবুও তাঁহার ঘরের গরুর গাড়ীতে জিনিসপত্র বোঝাই দিলেন। অনেকদিন আগেই দিতেন—শুধু বাধ্য হইয়াই পারেন নাই। দিন পাঁচ ছয় হইতেই আমার সমস্ত দেহটা এমনি একটা বিশ্রী আলস্যে ভরিয়া উঠিতেছিল যে, কিছুই ভাল লাগিত না। ভাবিতাম, রাত্ত-জাগা এবং

পরিশ্রমের জন্যই এরূপ বোধ হইত। সেদিন সকাল হইতেই মাথা টিপ্-টিপ্ করিতে লাগিল। নিতান্ত অরুচির উপর দুপুরবেলা যাহা-কিছু খাইলাম, অপরাহ্ণবেলায় বমি হইয়া গেল। রাত্রি ন'টা দশটার সময় টের পাইলাম জ্বর হইয়াছে। সেদিন সারারাত্রি ধরিয়াই তাঁহাদের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছিল, সবাই জাগিয়া ছিলেন। অনেক রাত্রে রামবাবুর স্ত্রী বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসী-দাদা, তুমি কেন আমাদের সঙ্গেই আরা পর্য্যন্ত চল না?

আমি বলিলাম, তাই যাবো। কিন্তু তোমাদের গাড়ীতে আমাকে একটু জায়গা দিতে হবে।

ভগিনী উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন সন্ন্যাসী-দাদা? গাড়ী ত দু'টোর বেশী পাওয়া গেল না আমাদের নিজেদের জায়গা হচ্ছে না।

আমি কহিলাম, আমার হাঁটবার যে ক্ষমতা নেই, দিদি! সকাল থেকেই বেশ জ্বর এসেছে।

জ্বর? বল কি গো?—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমার নূতন ভগিনী মুখ কালি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কতক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিতে পারি না। জাগিয়া দেখিলাম, বেলা হইয়াছে। বাড়ীর ভিতর ঘরে-ঘরে তালাবন্ধ—জনপ্রাণীও নাই।

বাহিরের যে ঘরটায় আমি থাকিতাম, তাহার সুমুখ দিয়াই এই গ্রামের কাঁচা রাস্তাটা আরা ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উপর দিয়া প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ-ছয়খানি গরুর গাড়ী মৃত্যুভীত নরনারী বোঝাই হইয়া ষ্টেশনে যাইত। সারাদিন অনেক চেষ্টার পরে ইহারই একখানাতে সন্ধ্যার সময় স্থান করিয়া উঠিয়া বসিলাম। যে প্রাচীন বেহারী ভদ্রলোকটি দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন, তিনি অতি প্রত্যূষেই ষ্টেশনের কাছে একটা গাছতলায় আমাকে নামাইয়া দিলেন। তখন আর আমার বসিবার সামর্থ্য ছিল না; সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। অদূরে একটা পরিত্যক্ত টিনের শেড্ ছিল। পূর্বে এটি মোসাফিরখানার কাজে ব্যবহৃত হইত: কিন্তু বর্তমান সময়ে বৃষ্টি-বাদলার দিন গরু-বাছুরের ব্যবহার ছাড়া আর

কোন কাজে লাগিত না। ভদ্রলোকটি ষ্টেশন হইতে একজন বাঙ্গালী যুবককে ডাকিয়া আনিলেন। আমি তাঁহারই দয়ায় জন-কয়েক কুলীর সাহায্যেই এই শেড্খানির মধ্যে নীত হইলাম।

আমার বড় দুর্ভাগ্য, আমি যুবকটির কোন পরিচয়ই দিতে পারিলাম না; কারণ, কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। মাস পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিবার যখন সুযোগ এবং শক্তি হইল, তখন সংবাদ লইয়া জানিলাম, বসন্ত-রোগে ইতিমধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার কথা শুনিয়া এইমাত্র জানিয়াছিলাম, তিনি পূর্ব্ববঙ্গের লোক এবং পনের টাকা বেতনে ষ্টেশনে চাকরী করেন। খানিক পরে তিনি তাঁহার নিজের শতজীর্ণ বিছানাটি আনিয়া হাজির করিলেন এবং বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি স্বহস্তে রাঁধিয়া খান এবং পরের ঘরে থাকেন। দুপুরবেলা একবাটি গরম দুধ আনিযা পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন, ভয় নাই, ভাল হইয়া যাইবেন; কিন্তু আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব কাহাকেও যদি সংবাদ দিবার থাকে ত ঠিকানা দিলে তিনি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতে পারেন।

তখনও আমার বেশ জ্ঞান ছিল। সুতরাং ইহাও বেশ বুঝিতেছিলাম, আর বেশীক্ষণ নয়। এমনি জ্বর যদি আর পাঁচ-ছয় ঘণ্টাও স্থায়ী হয় ত চৈতন্য হারাইতে হইবে। অতএব যাহা কিছু করিবার, ইতিমধ্যে না করিলে, আর করাই হইবে না।

তা বটে; কিন্তু সংবাদ দিবার প্রস্তাবে ভাবনায় পড়িলাম। কেন তাহা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ভাবিলাম, গরীবের টেলিগ্রামের পয়সাটা অপব্যয় করাইয়া আর লাভ কি?

সন্ধ্যার পর ভদ্রলোক তাঁর ডিউটির ফাঁকে এক ভাঁড় জল ও একটা কেরোসিনের ডিবা লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জ্বরের যন্ত্রণায় মাথা ক্রমশঃ বেঠিক হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম, যতক্ষণ আমার হুঁস আছে ততক্ষণ মাঝে মাঝে দেখবেন; তার পরে যা হয় তা হোক. আপনি আর কষ্ট করবেন না।

ভদ্রলোক অত্যন্ত মুখচোরা প্রকৃতির লোক। কথা সাজাইয়া

বলিবার ক্ষমতা ছিল না। প্রত্যুত্তরে তিনি শুধু 'না না' বলিয়াই চুপ করিলেন।

বলিলাম, আপনি সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার যথার্থ আপনার জন কেহ নাই। তবে পাটনায় পিয়ারী বাইজীর ঠিকানায় যদি একখানা পোষ্টকার্ড লিখে দেন যে শ্রীকান্ত আরা ষ্টেশনের বাইরে একটা টিন-শেডের মধ্যে মরণাপন্ন হয়ে পড়ে আছে, তা হ'লে—

ভদ্রলোক শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমি এখনি দিচ্চি, চিঠি এবং টেলিগ্রাফ দুই-ই পাঠিয়ে দিচ্চি।—বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, ভগবান, সংবাদটা যেন সে পায়।

* * * *

জ্ঞান হইয়া প্রথমটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মাথায় হাত দিয়া ঠাহর করিয়া টের পাইলাম, সেটা আইস্‌-ব্যাগ। চোখ মেলিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যে একটা খাটের উপর শুইয়া আছি। সুমুখের টুলের উপর একটা আলোর কাছে গোটা-দুই-তিন ঔষধের শিশি এবং তাহারই পাশে একটা দড়ির খাটিয়ার উপর কে একজন লাল-চেক্‌ র‍্যাপার গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই স্মরণ করিতে পারিলাম না। তারপরে একটু একটু করিয়া মনে হইতে লাগিল, ঘুমের ঘোরে কত কি যেন স্বপ্ন দেখিয়াছি। অনেক লোকের আসা-যাওয়া, ধরাধরি করিয়া আমাকে ডুলিতে তোলা, মাথা-ন্যাড়া করিয়া ওষুধ খাওয়ানো—এমনি কত কি ব্যাপার?

খানিক পরে লোকটি যখন উঠিয়া বসিল, দেখিলাম ইনি একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, বয়স আঠারো-উনিশের বেশী নয়। তখন আমার শিয়রের নিকট হইতে মৃদুকণ্ঠে যে তাহাকে সম্বোধন করিল, তাহার গলা চিনিতে পারিলাম।

পিয়ারী অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, বঙ্কু, বরফটা একবার কেন বদ্‌লে দিলিনে বাবা।

ছেলেটি বলিল, দিচ্চি, তুমি একটুখানি শোও না মা। ডাক্তারবাবু যখন ব'লে গেলেন, বসন্ত নয়, তখন ত আর কোনো ভয় নেই মা।

পিয়ারী কহিল, ওরে বাবা, ডাক্তারে ভয় নেই বললেই কি মেয়ে-মানুষের ভয় যায়? তোকে সে ভাবনা করতে হবে না বঙ্কু, তুই শুধু বরফটা বদলে দিয়ে শুয়ে পড়—আর জাগিস্‌নে।

বঙ্কু আসিয়া বরফ বদলাইয়া দিল এবং ফিরিয়া গিয়া সেই খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িল। অনতিবিলম্বে তাহার যখন নাক ডাকিতে লাগিল, আমি আস্তে আস্তে ডাকিলাম, "পিয়ারী!"

পিয়ারী মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কপালের জলবিন্দুগুলা আঁচলে মুছাইয়া লইয়া বলিল, আমাকে কি চিনতে পারচ? এখন কেমন আছ? কা—

ভাল আছি। কখন এলে? এ কি আরা?

হাঁ, আরা। কাল আমরা বাড়ী যাবো।

কোথায়?

পাটনায়। আমার বাড়ী ছাড়া আর কি কোথাও এখন তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি?

এই ছেলেটি কে, রাজলক্ষ্মী?

আমার সতীন-পো। কিন্তু বঙ্কু আমার পেটের ছেলেই। আমার কাছে থেকেই ও পাটনা কলেজে পড়ে। আজ আর কথা ক'য়ো না, ঘুমোও কাল সব কথা বলব। বলিয়া সে আমার মুখের উপর হাত চাপা দিয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

আমি হাত বাড়াইয়া রাজলক্ষ্মীর ডান-হাতখানি মুঠার মধ্যে লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

বারো

যাহাতে অচৈতন্য শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বসন্ত নয়, অন্য জ্বর। ডাক্তারি-শাস্ত্রে নিশ্চয়ই তাহার একটা কিছু গালভরা শক্ত নাম ছিল, কিন্তু আমি তাহা অবগত নই। খবর পাইয়া পিয়ারী তাহার ছেলেকে

লইয়া, জন-দুই ভৃত্য এবং দাসী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইদিনই একটা বাসা ভাড়া করিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করে এবং সহরের ভাল-মন্দ নানাবিধ চিকিৎসক জড় করিয়া ফেলে। ভালই করিয়াছিল। না হইলে, অন্য ক্ষতি না হোক, 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যের মহিমাটা সংসারে অবিদিত থাকিয়া যাইত।

ভোরবেলা পিয়ারী কহিল, বঙ্কু, আর দেরী করিস্‌নে বাবা, এইবেলা একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী রিজার্ভ করে আয়! আমি একদণ্ডও এখানে রাখতে আর সাহস করিনে।

বঙ্কুর অতৃপ্ত নিদ্রা তখনও দু' চক্ষু জড়াইয়া ছিল, সে মুদ্রিত-নেত্রে অব্যক্ত-স্বরে জবাব দিল, তুমি ক্ষেপেচ মা, এ অবস্থায় কি নাড়ানাড়ি করা যায়?

পিয়ারী একটু হাসিয়া কহিল, আগে তুই উঠে চোখে-মুখে জল দে দেখি, তারপরে নাড়ানাড়ির কথা বোঝা যাবে। লক্ষ্মী বাপ আমার, ওঠ্।

বঙ্কু অগত্যা শয্যা ত্যাগ করিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, ষ্টেশনে চলিয়া গেল। তখন সবেমাত্র সকাল হইতেছিল—ঘরে আর কেহ ছিল না। ধীরে ধীরে ডাকিলাম, "পিয়ারী!"

আমার শিয়রের দিকে আর একখানা খাটিয়া জোড়া দেওয়া ছিল। তাহারই উপরে ক্লান্তিবশতঃ বোধ করি সে ইতিমধ্যে একটুখানি চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল; ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। কোমল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ঘুম ভাঙ্গল?

আমি ত জেগেই আছি।

পিয়ারী উৎকণ্ঠিত যত্নের সহিত আমার মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, জ্বর এখন খুব কম। একটুখানি চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা কর না কেন?

তা তো বরাবরই করচি, পিয়ারী! আজ জ্বর আমার ক'দিন হ'লো?

তেরো দিন, বলিয়াই সে কতই যেন একটা বর্ষীয়সী প্রবীণার মত গম্ভীরভাবে কহিল, দেখ, ছেলেপিলেদের সামনে আর আমাকে ও ব'লে ডেকো না। চিরকাল লক্ষ্মী ব'লে ডেকেচ, তাই কেন বল না?

দিন-দুই হইতেই আমি পূর্ণ সচেতন ছিলাম। আমার সমস্ত কথাই স্মরণ হইয়াছিল। বলিলাম, আচ্ছা। তারপরে যাহা বলিবার জন্য ডাকিয়াছিলাম, মনে-মনে সেই কথাগুলি একটু গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করচ—কিন্তু তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েচি, আর দিতে চাইনে।

তবে কি করতে চাও?

আমি ভাবছি এখন যেমন আছি, তাতে তিন চারদিনেই বোধ হয় এক-রকম সেরে যাবো। তোমরা বরঞ্চ এই ক'টা দিন অপেক্ষা করে বাড়ী যাও।

তখন তুমি কি করবে শুনি?

সে যা হয় হবে।

তা হবে, বলিয়া পিয়ারী একটুখানি হাসিল। তারপর সুমুখে উঠিয়া আসিয়া খাটের একটা বাজুর উপর বসিয়া, আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া, আবার একটু হাসিয়া কহিল, তিন চারদিনে না হোক, দশ-বারোদিনে এ রোগ সারবে তা জানি, কিন্তু আসল রোগটা কতদিনে সারবে আমাকে বলতে পারো?

আসল রোগ আবার কি?

পিয়ারী কহিল, ভাববে একরকম, বলবে একরকম, করবে আর এক-রকম—চিরকাল ঐ এক রোগ! তুমি জানো যে, একমাসের আগে তোমাকে চোখের আড়াল করতে পারব না—তবু বলবে—তোমাকে কষ্ট দিলুম, তুমি যাও। ওগো দয়াময়! আমার ওপর যদি তোমার এতই দরদ—তবে যাই হোক গে—সন্ন্যাসী নও, সন্ন্যাসী সেজে কি হাঙ্গামাই বাধালে। এসে দেখি, মাটির ওপরে ছেঁড়া কাঁথায় পড়ে অঘোর অচৈতন্য! মাথাটা ধুলো-কাদায় জট পাকিয়েচে, সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষি বাঁধা; হাতে দু'গাছা পেতলের বালা। মা গো মা! দেখে কেঁদে বাঁচিনে।—বলিতে বলিতেই উদ্বেল অশ্রুজল তাহার দুই চোখ ভরিয়া টল-টল করিয়া উঠিল। হাত দিয়া তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, বঙ্কু বলে, ইনি কে মা? মনে মনে বললুম, তুই ছেলে, তোর কাছে সে-কথা আর কি

বলব বাবা। উঃ, কি বিপদের দিনই সে দিনটা গেছে! মাইরি, কি শুভক্ষণেই পাঠশালে দু'জনের চার চক্ষু দেখা হয়েছিল! যে দুঃখটা তুমি আমাকে দিলে, এত দুঃখ ভূ-ভারতে কেউ কখনো কাউকে দেয়নি—দেবে না। সহরের মধ্যে বসন্ত দেখা দিয়েচে—সবাইকে নিয়ে ভালোয় ভালোয় পালাতে পারলে যে বাঁচি।—বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

সেই রাত্রেই আমরা আরা ত্যাগ করিলাম। একজন ছোকরা ডাক্তারবাবু অনেকপ্রকার ঔষধের সরঞ্জাম লইয়া আমাদের পাটনা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে সঙ্গে গেলেন।

পাটনায় পৌঁছিয়া বার তেরোদিনের মধ্যে একপ্রকার সারিয়া উঠিলাম। একদিন সকালে পিয়ারীর বাড়ী একলা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া আসবাবপত্র দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। এমন যে ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই তাহা নয়। জিনিষগুলি ভালো এবং বেশী মূল্যের, তা বটে; কিন্তু এই মাড়োয়ারী পাড়ার মধ্যে, এইসকল ধনী ও অল্পশিক্ষিত সৌখীন মানুষের সংস্রবে এত সামান্য জিনিষপত্রেই এ সন্তুষ্ট রহিল কি করিয়া? ইতিপূর্ব্বে আমি আরও যতগুলি এই ধরণের ঘর-দ্বার দেখিয়াছি, তাহাদের সহিত কোথাও কোন অংশে ইহার সাদৃশ্য নাই। সেখানে ঢুকিলেই মনে হইয়াছে, ইহার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালও অবস্থান করে কি করিয়া? ইহার ঝাড়-লণ্ঠন, ছবি, দেয়ালগিরি, আয়না, গ্লাসকেসের মধ্যে আনন্দের পরিবর্ত্তে আশঙ্কা হয়—সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসের অবসরটুকুও বুঝি মিলিবে না; বহুলোকের বহুবিধ কামনা-সাধনার উপহাররাশি এমনি ঠাসাঠাসি গাদাগাদিভাবে চোখে পড়ে যে, দৃষ্টিমাত্রেই মনে হয়, এই অচেতন জিনিষগুলার মত তাহাদের সচেতন দাতারাও যে এই বাড়ীর মধ্যে একটুখানি জায়গার জন্য এমনি ভিড় করিয়া পরস্পরের সহিত রেষারেষি অতিরিক্ত ঠেলাঠেলি করিতেছে। কিন্তু এ-বাড়ীতে কোন আবশ্যকীয় অতিরিক্ত একটা বস্তুও চোখে পড়িল না, এবং যাহা চোখে পড়িল না, এবং যাহা চোখে পড়িল, সেগুলি যে গৃহস্বামিনীর আপনার প্রয়োজনেই আহৃত হইয়াছে, এবং তাহার নিজের ইচ্ছা এবং অভিরুচিকে অতিক্রম

করিয়া আর কাহারও প্রলুব্ধ অভিলাষ যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া জায়গা জুড়িয়া বসিয়া নাই, তাহা অতি সহজেই বুঝা গেল। আরও একটা ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একটা নামজাদা বাইজীর গৃহে গান-বাজনার কোন আয়োজন কোথাও নাই। এ-ঘরে সে-ঘরে ঘুরিয়া দোতলার একটা কোণের ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এটি যে বাইজীর নিজের শয়নমন্দির, তাহার ভিতরে চাহিবামাত্রই টের পাইলাম; কিন্তু আমার কল্পনার সহিত ইহার কতই না প্রভেদ! যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহার কিছুই নাই: মেঝেটি শাদা পাথরের, দেয়ালগুলি দুধের মত শাদা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। ঘরের একধারে একটি ছোট তক্তাপোষের উপর বিছানা পাতা। একটি কাঠের আলনায় খান-কয়েক বস্ত্র এবং তাহারই পিছনে একটি লোহার আলমারী। আর কোথাও কিছু নাই! জুতাপায়ে প্রবেশ করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইল—চৌকাটের বাহিরে খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। বোধ করি ক্লান্তি বশতঃই তাহার শয্যায় আসিয়া বসিয়াছিলাম, না হইলে ঘরে আর কিছু বসিবার জায়গা থাকিলে তাহাতেই বসিতাম।

সুমুখের খোলা জানালা ডাকিয়া একটা মস্ত নিমগাছ: তাহার ভিতর দিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া বাতাস আসিতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া হঠাৎ কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা মিষ্ট শব্দে চমকিত হইয়া দেখিলাম, গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়াছে। সে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে ভিজা কাপড় ছাড়িতে আসিয়াছে। সে এদিকে একেবারেই তাকায় নাই; সোজা আলনার কাছে গিয়া শুষ্কবস্ত্রে হাত দিতেই, আমি ব্যস্ত হইয়া সাড়া দিলাম—ঘাটে কাপড় নিয়ে যাও না কেন?

পিয়ারী চমকিয়া চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, আঁা—চোরের মত আমার ঘরে ঢুকে বসে আছ? না, না, ব'সো ব'সো—যেতে হবে না; আমি ও-ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আসচি; বলিয়া লঘু-পদক্ষেপে গরদের কাপড়খানি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট-পাঁচেক পরে প্রফুল্লমুখে ফিরিয়া আসিয়া হাসিয়া কহিল,

আমার ঘরে ত কিছুই নেই ; তবে কি চুরি করতে এসেছিলে বল ত ? আমাকে নয় ত !

আমি বলিলাম, আমাকে এমনি অকৃতজ্ঞ পেয়েচ ? তুমি আমার এত করলে, আর শেষে তোমাকেই চুরি করব ? আমি অত লোভী নই।

পিয়ারীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। কথাটায় সে ব্যথা পাইতে পারে, বলিবার সময় তাহা ভাবি নাই। ব্যথা দিবার ইচ্ছাও ছিল না, থাকা স্বাভাবিকও নয়। বিশেষতঃ দুই-একদিনের মধ্যেই আমি প্রস্থানের সঙ্কল্প করিতেছিলাম। বেফাঁস কথাটা সারিয়া লইবার জন্য জোর করিয়া হাসিয়া বলিলাম, নিজের জিনিষ বুঝি কেউ চুরি করতে আসে ? এই তোমার বুদ্ধি ?

কিন্তু এত সহজে তাকে ভুলানো গেল না। মলিন-মুখে কহিল, তোমাকে আর কৃতজ্ঞ হতে হবে না—দয়া করে সে-সময়ে যে একটা খবর পাঠিয়েছিলে, এই আমার ঢের।

তাহার শুদ্ধস্নাত প্রফুল্ল হাসি-মুখখানি এই রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল-বেলাটাতেই ম্লান করিয়া দিলাম দেখিয়া, একটা বেদনার মত বুকের মধ্যে বাজিতে লাগিল। সেই হাসিটুকুর মধ্যে কি যেন একটা মাধুর্য্য ছিল যে, তাহা নষ্ট হইবামাত্র ক্ষতিটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ফিরিয়া পাইবার আশায় তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত-স্বরে বলিয়া উঠিলাম, লক্ষ্মী, তোমার কাছে ত লুকানো কিছু নেই—সবই জানো। তুমি না গেলে আমাকে সেই ধূলোবালির উপরেই মরে থাকতে হ'তো. কেউ ততদূরে গিয়ে একবার হাসপাতালে পাঠাবার চেষ্টা পর্য্যন্তও করত না। সেই যে চিঠিতে লিখেছিলে, সুখের দিনে না হোক, দুঃখের দিনে যেন মনে করি - নেহাৎ পরমায়ু ছিল বলে কথাটা মনে পড়েছিল, তা এখন বেশ বুঝতে পারি।

পারো ?

নিশ্চয়।

তাহলে আমার জন্যই প্রাণটা ফিরে পেয়েচ বল ?

তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

তাহলে ওটা দাবী করতে পারি বল ?

তা পারো। কিন্তু আমার প্রাণটা এত তুচ্ছ যে, তার পরে তোমার লোভ হওয়াই উচিত নয়।

পিয়ারী এতক্ষণ পরে একটু হাসিয়া বলিল, তবু ভাল যে নিজের দামটা এতদিনে টের পেয়েচ। কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, তামাসা থাক্—অসুখ ত একরকম ভালো হ'লো, এখন যাবে কবে মনে করচ?

তাহার প্রশ্ন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। গম্ভীর হইয়া কহিলাম, কোথাও যাবার ত আমার এখন তাড়া নেই। তাই আরও কিছুদিন থাকব ভাবছি।

পিয়ারী কহিল, কিন্তু আমার ছেলে প্রায়ই আজকাল বাঁকিপুর থেকে আসচে। বেশীদিন থাকলে সে হয়ত কিছু ভাবতে পারে।

আমি বলিলাম, ভাবলেই বা! তাকে ত তোমার ভয় করে চলতে হয় না। এমন আরাম ছেড়ে শীঘ্র কোথাও নড়চিনে।

পিয়ারী বিরস-মুখে বলিল, তা কি হয়? বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া গেল।

পরদিন বিকালবেলায় আমার ঘরের পশ্চিমদিকের বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারে শুইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলাম, বঙ্কু আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদিন তাহার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার সুযোগ হয় নাই। একটা চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলাম, বঙ্কু, কি পড় তুমি?

ছেলেটি অতিশয় সাদাসিধা ভালমানুষ। কহিল, গতবৎসর আমি এণ্ট্রান্স পাশ করেচি।

এখন তাহলে বাঁকিপুর কলেজেই পড়চ ত?

আজ্ঞে হাঁ।

তোমরা ক'টি ভাই-বোন?

ভাই আর নেই। চারিটি বোন।

তাদের বিয়ে হয়ে গেছে?

আজ্ঞে হাঁ, মা-ই বিয়ে দিয়েচেন।

তোমার আপনার মা বেঁচে আছেন ?

আজ্ঞে হাঁ, তিনি দেশের বাড়ীতেই আছেন।

তোমার এ মা কখনো তোমাদের বাড়ীতে গেছেন ?

অনেকবার। এই ত পাঁচ-ছ'মাস হ'লো এসেচেন।

সেজন্য দেশে কোন গোলযোগ হয় না ?

বঙ্কু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, হ'লোই বা! আমাদের একঘরে করে রেখেচে বলে ত আর আমি আপনার মাকে ত্যাগ করতে পারিনে! আর অমন মা-ই বা ক'জনের আছে!

মুখে আসিল জিজ্ঞাসা করি, মায়ের উপর এত ভক্তি আসিল কিরূপে ? কিন্তু চাপিয়া গেলাম।

বঙ্কু কহিতে লাগিল, আচ্ছা আপনিই বলুন, গান-বাজনা করাতে কি কোন দোষ আছে ? আমার মা ত শুধু তাই করেন। পরনিন্দে পরচর্চ্চা ত করেন না ? বরঞ্চ গ্রামে আমাদের যারা পরম শত্রু, তাদেরই আট-দশজন ছেলের পড়ার খরচ দেন, শীতকালে কত লোককে কাপড় দেন, কম্বল দেন। এ কি মন্দ কাজ করেন ?

আমি বলিলাম, না। এ ত খুব ভাল কাজ।

বঙ্কু উৎসাহিত হইয়া কহিল, তবে বলুন ত! আমাদের গাঁয়ের মত পাজি গাঁ কোথাও আছে ? এই দেখুন না, সে-বছর ইট পুড়িয়ে আমাদের কোঠাবাড়ী তৈরী হ'লো। গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট দেখে মা আমার মাকে বললেন, দিদি, আরও কিছু টাকা খরচ করে ইটখোলাটাকেই একটা পুকুর কাটিয়ে দিই। তিন-চার হাজার টাকা খরচ করে তাই করে দিলেন, ঘাট বাঁধিয়ে দিলেন। কিন্তু গাঁয়ের লোক সে পুকুর মাকে প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না। অমন জল, কিন্তু কেউ খাবে না, ছোঁবে না, এমনি বজ্জাত লোক। কেবল এই হিংসায় সবাই মরে যায় যে, আমাদের কোঠাবাড়ী তৈরী হ'লো। বুঝলেন না ?

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, বল কি হে ? এই দারুণ জলকষ্ট ভোগ করবে, তবু অমন জল ব্যবহার করবে না ?

বঙ্কু একটু হাসিয়া কহিল, তাই ত। কিন্তু সে কি বেশি দিন চলে ?

প্রথম বছর ভয়ে কেউ সে জল ছুঁলে না ; কিন্তু এখন ছোটলোকেরা সবাই নিচ্ছে, খাচ্ছে—বামুন-কায়েতরাও চৈত্র-বৈশাখ মাসে লুকিয়ে জল নিয়ে যাচ্চে—কিন্তু তবু পুকুর প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না—এ কি মায়ের কষ্ট !

আমি কহিলাম, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙবার যে একটা কথা আছে, এযে দেখি তাই।

বন্ধু জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, ঠিক তাই। এমন গাঁয়ে আলাদা একঘরে হয়ে থাকাই শাপে বর। আপনি কি বলেন ?

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলাম, হা-না স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিলাম না। কিন্তু সেজন্য বন্ধুর উদ্দীপনা বাধা পাইল না। দেখিলাম, ছেলেটি তাহার বিমাতাকে সত্যই ভালবাসে ! অনুকূল শ্রোতা পাইয়া ভক্তির আবেগে সে দেখিতে দেখিতে মাতিয়া উঠিল এবং তাঁহার অজস্র স্তুতিবাদে আমাকে প্রায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

হঠাৎ একসময়ে তাহার হুঁস হইল যে, ততক্ষণের মধ্যে আমি একটি কথাতেও কথা যোগ করি নাই। তখন সে অপ্রতিভ হইয়া কোনমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কিছুদিন এখানে আছেন ত ?

আমি হাসিয়া বলিলাম, না, কাল সকালেই আমি যাচ্ছি।

কাল ?

হাঁ, কালই।

কিন্তু আপনার দেহ ত এখনো সবল হয়নি। অসুখটা একেবারে সেরেচে বলে কি আপনার মনে হচ্ছে ?

বলিলাম, সকাল পর্য্যন্ত সেরেচে বলেই মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না। আজ দুপুর থেকেই আবার মাথাটা ধরেচে।

তবে কেন এত শীঘ্র যাবেন ? এখানে ত আপনার কোন কষ্ট নেই, —বলিয়া ছেলেটি চিন্তিত-মুখে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমিও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া তাহার মুখের উপর ভিতরের যথার্থ কথাটা পড়িতে চেষ্টা করিলাম ; যতটা পড়িলাম, তাহাতে সত্য গোপনের কোন প্রয়াস অনুভব করিলাম না। তবে ছেলেটি

লজ্জা পাইল বটে, এবং সেই লজ্জাটা ঢাকিয়া ফেলিবারও চেষ্টা করিল; কহিল, আপনি এখন যাবেন না।

কেন বল দেখি?

আপনি থাকলে মা বড় আনন্দে থাকেন।—বলিয়া ফেলিয়াই মুখ রাঙা করিয়া চট করিয়া উঠিয়া গেল।

দেখিলাম, ছেলেটি খুবই সরল বটে, কিন্তু নির্ব্বোধ নয়। পিয়ারী কেন যে বলিয়াছিল, আর বেশীদিন থাকলে আমার ছেলে কি ভাববে! কথাটার সহিত ছেলেটির ব্যবহার আলোচনা করিয়া অর্থটা যেন বুঝিতে পারিলাম বলিয়া মনে হইল। মাতৃত্বের এই একটা ছবি আজ চোখে পড়ায় যেন একটা নতুন জ্ঞান লাভ করিলাম। পিয়ারীর হৃদয়ের একাগ্র বাসনা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন নয়, এবং সে যে সংসারের সবদিক্ দিয়া সর্ব্বপ্রকারেই স্বাধীন, তাহাও কল্পনা করা বোধ করি পাপ নয়। তবুও সে যে মুহূর্ত্তে এই একটা দরিদ্র বালকের মাতৃপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, অমনি সে নিজের দুটি পায়ে শত-পাকে বেড়িয়া লোহার শিকল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। আপনি সে যাই হোক, কিন্তু সেই-আপনাকে মায়ের সম্মান তাহাকে ত এখন দিতেই হইবে! তাহার অসংযত কামনা, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি যত অধঃপাতেই তাহাকে ঠেলিতে চাহুক, কিন্তু এ কথাও সে ভুলিতে পারে না—সে একজনের মা; এবং সেই সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সম্মুখে তাহার মাকে ত সে কোনমতেই অপমানিত করিতে পারে না! তাহার বিহ্বল-যৌবনের লালসামত্ত বসন্তদিনে কে যে ভালবাসিয়া তাহার পিয়ারী নাম দিয়াছিল, আমি জানি না, কিন্তু এই নামটা পর্য্যন্ত সে তাহার ছেলের কাছে গোপন করিতে চায়, এই কথাটা আমার স্মরণ হইয়া গেল।

চোখের উপর সূর্য্য অস্ত গেল। সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা যেন গলিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিলাম, রাজলক্ষ্মীকে আর ত আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারি না! আমাদের বাহ্য ব্যবহার যত বড় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই এতদিন চলুক না, স্নেহ যত মাধুর্য্যই ঢালিয়া দিক না, উভয়েরই কামনা যে একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য

অনুক্ষণ দুর্নিবারবেগে ধাবিত হইতেছিল, তাহাতে ত সংশয় নাই। কিন্তু আজ দেখিলাম, অসম্ভব। হঠাৎ বঙ্কুর মা অভ্রভেদী হিমালয়ের ন্যায় পথ রুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে মনে বলিলাম, কাল সকালেই ত আমি এখান হইতে যাইতেছি, কিন্তু তখন যেন মনের লাভালাভের হিসাব করিতে গিয়া হাতের পাঁচ রাখিবার চেষ্টা না করি। আমার এই যাওয়াটা যেন যাওয়াই হয়। দেখিতে নাই চাই—ছল করিয়া একখানি অতিসূক্ষ্ম বাসনার বাঁধন রাখিয়া না যাই, যাহার সূত্র ধরিয়া আবার একদিন আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়।

অন্যমনস্ক হইয়া সেখানেই বসিয়াছিলাম; সন্ধ্যার সময় ধুনোচিতে ধূপ-ধুনা দিয়া, সেটা হাতে করিয়া রাজলক্ষ্মী এই বারান্দা দিয়াই আর একটা ঘরে যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মাথা ধরেচে, হিমে বসে কেন—ঘরে যাও।

হাসি পাইল। বলিলাম, অবাক করলে লক্ষ্মী! হিম এখানে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হিমন। থাক্, ঠাণ্ডা বাতাস ত বইচে। সেইটাই কোন্ ভাল?

না, সেও তোমার ভুল। ঠাণ্ডা গরম কোন বাতাসই বইচে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার সমস্তই ভুল। কিন্তু মাথাধরাটা ত আর আমার ভুল নয়—সেটা সত্যি! ঘরে গিয়ে একটু শুয়েই পড় না? রতন কি করচে? সে কি একটু ওডিকোলন মাথায় দিয়ে দিতে পারে না? এ-বাড়ীর চাকরগুলোর মত 'বাবু' চাকর আর পৃথিবীতে নেই!—বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের কাজে চলিয়া গেল।

রতন যখন ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া ওডিকোলন, জল প্রভৃতি আনিয়া হাজির করিল এবং তাহার ভুলের জন্য বারম্বার অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

রতন সাহস পাইয়া আস্তে আস্তে কহিল, এতে আমার যে দোষ নেই, সে কি আমি জানিনে বাবু? কিন্তু মাকে ত বলবার জো নেই যে, তুমি রেগে থাকলে মিছিমিছি বাড়ীসুদ্ধ লোকের দোষ দেখতে পাও।

কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলাম, রাগ কেন ?

রতন কহিল, সে কি কারো জানবার জো আছে ? বড়লোকের রাগ বাবু শুধু-শুধু হয়, আবার শুধু-শুধু যায়। তখন গা-ঢাকা দিয়ে না থাকতে পারলেই চাকর-বাকরদের প্রাণ গেল।

দ্বারের নিকট হইতে হঠাৎ প্রশ্ন আসিল—তখন তোদের কি আমি মাথা কেটে নি রে, রতন। আর বড়লোকের বাড়ীতে যদি এত জ্বালা ত আর কোথাও যাস্‌নে কেন ?

মনিবের প্রশ্নে রতন কুণ্ঠিত অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, তোর কাজটা কি ? ওঁর মাথা ধরেচে—বঙ্কুর মুখে শুনে আমি তোকে জানালুম। তাই এখন আটটা রাত্তিরে এসে আমার সুখ্যাতি গাইচিস্‌। কাল থেকে আর কোথাও কাজের চেষ্টা করিস্‌—এখানে হবে না। বুঝলি !

রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেলে, রতন ওডিকোলনে জল দিয়া আমার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাল সকালেই নাকি বাড়ী যাবে ?

আমার যাবার সঙ্কল্প ছিল বটে, কিন্তু বাড়ী ফিরিবার সঙ্কল্প ছিল না। তাই প্রশ্নটার আর-একরকম করিয়া জবাব দিলাম, হাঁ কাল সকালেই যাব।

সকাল ক'টার গাড়ীতে যাবে ?

সকালেই বেরিয়ে পড়ব—তাতে যে গাড়ী জোটে।

আচ্ছা। একখানা টাইম-টেবিলের জন্য কাউকে না হয় ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিই গে।—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তারপরে যথাসময়ে রতন কাজ সারিয়া প্রস্থান করিল। নীচে তাদের সাড়া-শব্দ নীরব হইল; বুঝিলাম সকলেই এবার নিদ্রার জন্য শয্যাশ্রয় করিয়াছে।

আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া একটা কথা কেবলই মনে হইতে লাগিল, পিয়ারী বিরক্ত হইল কেন ? এমন কি করিয়াছি যাহাতে সে আমার যাওয়ার জন্যই অধীর হইয়া উঠিয়াছে ? রতন বলিয়াছিল, বড়লোকের ক্রোধ শুধু-শুধু হয়। কথাটা আর কোন

বড়লোকের সম্বন্ধে খাটে কি না জানি না, কিন্তু পিয়ারীর সম্বন্ধে কিছুতেই খাটে না। সে যে অত্যন্ত সংযমী এবং বুদ্ধিমতী, সে পরিচয় আমি বহুবার পাইয়াছি, এবং আমার নিজেরও বুদ্ধি নাই থাক্, প্রবৃত্তি-সম্পর্কে সংযম তার চেয়ে কম নয়—বোধ করি কারও চেয়ে কম নয়। বুকের মধ্যে যাই হোক, মুখ দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া আনা আমার অতিবড় বিকারের ঘোরেও সম্ভব বলিয়া মনে করি না। ব্যবহারেও কোনদিন কিছু ব্যক্ত করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তাহার নিজের কার্য্যের দ্বারা লজ্জার হেতু কিছু ঘটিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা; কিন্তু আমার উপর রাগ করিবার তাহার কিছুমাত্র কারণ নাই। সুতরাং বিদায়ের সময় তাহার এই ঔদাসীন্য আমাকে যে বেদনা দিতে লাগিল, তাহা অকিঞ্চিৎকর নয়।

অনেক রাত্রে হঠাৎ একসময়ে তন্দ্রা ভাঙিয়া চোখ মেলিলাম। দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া, টেবিলের উপর হইতে আলোটা সরাইয়া ওদিকে দরজার কোণে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল। সুমুখের জানালাটা খোলা ছিল—তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার শয্যার কাছে আসিয়া একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিয়া রহিল। তারপরে মশারির ভিতরে হাত দিয়া প্রথমে আমার কপালের উত্তাপ অনুভব করিল; পরে জামার বোতাম খুলিয়া বুকের উত্তাপ বারম্বার অনুভব করিতে লাগিল। নিভৃতচারিণীর এই গোপন করস্পর্শে প্রথমটা কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু তখনই মনে হইল, সংজ্ঞাহীন রোগে সেবা করিয়া যে চৈতন্য ফিরাইয়া আনিয়াছে, তাহার কাছে আমার লজ্জা পাইবার আছে কি! তাহার পরে সে বোতাম বন্ধ করিল; গায়ের কাপড়টা সরিয়া গিয়াছিল, গলা পর্য্যন্ত টানিয়া দিল; শেষে মশারির ধারগুলা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া অত্যন্ত সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি সমস্তই দেখিলাম, সমস্তই বুঝিলাম। যে গোপনেই আসিয়াছিল, তাহাকে গোপনেই যাইতে দিলাম। কিন্তু এই নির্জ্জন নিশীথে সে যে তাহার কতখানি আমার কাছে ফেলিয়া রাখিয়া গেল, তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। সকলে প্রস্ফুট জ্বর লইয়াই ঘুম ভাঙ্গিল। চোখ-মুখ জ্বালা

করিতেছে ; মাথা এত ভারী যে, শয্যাত্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল। তবুও যাইতেই হইবে। এ-বাটীতে নিজেকে আর একদণ্ডও বিশ্বাস নাই —সে যে-কোন মুহূর্ত্তেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। নিজের জন্যও তত নয়। কিছু রাজলক্ষ্মীর জন্যই রাজলক্ষ্মীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র দ্বিধা করা চলিবে না।

মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, সে তাহার বিগত-জীবনের কালি অনেকখানিই ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। আজ তাহার চারিপাশে ছেলেমেয়েরা মা বলিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রীতি ও ভক্তির আনন্দধাম হইতে তাহাকে অসম্মানিত করিয়া, ছিনাইয়া বাহির করিয়া আনিব—এতবড় প্রেমের এই সার্থকতা কি অবশেষে আমার জীবন অধ্যায়েই চিরদিনের জন্যই লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, এখন দেহটা কেমন আছে ?

বলিলাম, খুব মন্দ নয়। যেতে পারব।

আজ না গেলেই কি নয় ?

হাঁ, আজ যাওয়া চাই।

তাহলে বাড়ী পৌঁছেই একটা খবর দিয়ো! নইলে আমাদের বড় ভাবনা হবে।

তাহার অবিচলিত ধৈর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলাম, আচ্ছা, আমি বাড়ীতেই যাব। আর গিয়েই তোমাকে খবর দেবো।

পিয়ারী কহিল, দিয়ো। আমিও চিঠি লিখে তোমাকে দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

বাহিরে পাল্‌কিতে যখন উঠিতে যাইতেছি, দেখি দ্বিতলের বারান্দায় পিয়ারী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বুকের ভিতর যে কি করিতেছিল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা জানিতে পারিলাম না।

আমার অন্নদাদিদিকে মনে পড়িল। বহুকাল পূর্ব্বের একটা শেষদিনে তিনিও যেন ঠিক এমনি গম্ভীর, এমনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সেই দুইটি করুণ চোখের দৃষ্টি আমি আজও ভুলি নাই, কিন্তু সে

চাহনিতে তখন কতবড় একটা আসন্ন বিদায়ের ব্যথা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত পড়িতে পারি নাই। কি জানি, আজিও তেমনিধারা একটা কিছু ওই দুটি নিবিড় কালো চোখের মধ্যেও আছে কি না।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাল্‌কিতে উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে। ছোট-খাটো প্রেমের সাধ্যও ছিল না—এই সুখৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্নেহ-স্বর্গ হইতে মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য আমাকে আজ একপদও নড়াইতে পারিত। বাহকেরা পাল্‌কি লইয়া ষ্টেশন-অভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মনে মনে বারম্বার বলিতে লাগিলাম, লক্ষ্মী, দুঃখ করিয়ো না ভাই, এ ভালই হইল যে, আমি চলিলাম। তোমার ঋণ ইহ-জীবনে শোধ করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু যে-জীবন তুমি দান করিলে, সে-জীবনের অপব্যবহার করিয়া আর না তোমার অপমান করি—দূরে থাকিলেও এ সঙ্কল্প আমি চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিব।